মনপবনের নাও

রৈবত

দিগন্ত পাবলিশার্স

প্রকাশক
অজিত দত্ত
দিগন্ত পাব্লিশার্স
২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা, ২৯

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৫৭

দাম দু টাকা আট আনা

মুদ্রাকর
শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়
৫নং চৌরঙ্গী টেরাস
শ্রীশক্তি প্রেস
কলিকাতা-২০

লেখকের নিবেদন

স্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করার ত্রুটি এই যে, অনেক সময় তা রূঢ়বাক্য বলে মনে হয়। এ বইয়ে সাহিত্যাদি নানা বিষয়ে আমার মত সোজাসুজি প্রকাশ করেছি বলে ভয় হয় পাছে কেউ আমাকে ভুল বোঝেন। তাই সবিনয় নিবেদন করি, সাহিত্যিক বা শিল্পীরাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। তাঁদের মধ্যে কোনো সম্প্রদায় গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে কোনোরূপ অহেতুক আঘাত করতে চাইনি। যা লিখেছি তা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এবং সাহিত্য-পাঠকের সহজ অধিকারে।

এ বই 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময় এবং তার পর বহু পাঠক ও সাহিত্যিক বন্ধু একে পুস্তকাকারে পাবার জন্য আগ্রহ জানান। তাঁদেরই আগ্রহে 'মন পবনের নাও' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোল। বইটিতে পূর্বলিখিত অনেক অংশ পুনর্লিখিত হয়েছে এবং বিষয়ানুযায়ী পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

রৈবত

শ্রীপরিমল রায়

সুহৃদ্বরেষু

মনপবনের নাও

১

সাহিত্য ও প্রচার

আমার বাড়ির কাছাকাছি এক চায়ের দোকানের উদ্বোধন হোল। ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে সামান্য হলেও, এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ফলে বর্তমানে আমার পক্ষে মনের স্থৈর্য রেখে যে-কোনো কাজ করাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন দোকানের সদাশয় মালিক তাঁর শুভ ব্যবসারম্ভে খান আষ্টেক রেকর্ড সমন্বিত একটি গ্রামোফোন সহযোগে অবিরাম সঙ্গীত বিতরণের ব্যবস্থা করে আমাকে বড়ই কাহিল করেছেন। সঙ্গীতে আমার অত্যধিক অনুরাগ না থাকলেও অসঙ্গত বিরাগও কিছু নেই। কিন্তু সারাদিন ধরে, লিখতে পড়তে খেতে শুতে সর্বদাই, আটখানি আধুনিক সঙ্গীতের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে হাবুডুবু খেতে বাধ্য হবারও আমি কোনো মানে পাই না।

বস্তুত, সঙ্গীত-তাড়িত মনের এখন এরূপ অবস্থা যে চায়ের দোকানের প্রসন্নচিত্ত মালিক মশাইকে সম্মুখে পেলে তাঁর সঙ্গে আমার একটা দারুণ কলহ ঘটে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা। অথচ ভেবে দেখতে গেলে ভদ্রলোক যা করেছেন তা তাঁর ব্যবসার পক্ষে হয়তো ফলপ্রদই হবে। আমার কথাই ধরুন। এই যে বাড়ির কাছাকাছি একটা চায়ের দোকান খোলা হোল, তা হয়তো আগামী

কয়েক মাসের মধ্যেও আমি জানতে পারতাম না। কিন্তু সঙ্গীতের গুঁতোয় ও-তথ্যটা এখন এমন মজবুত ভাবে মগজে গেঁথে গেছে যে কিছুদিন বাদে — ভগবান না করুন — চায়ের দোকানটি উঠে গেলেও ওর উদ্বোধনের কথা ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে শক্ত হবে।

কেবল আমি নয়, এ পাড়ার সঙ্গীত-বিমুখ ও সঙ্গীত-প্রিয়, চাকুরে ও বেকার, গৃহবাসী ও পথচারী, কাছাকাছির মধ্যে প্রায় সকলেই চায়ের দোকান খোলার সংবাদটি এতক্ষণে জেনে গেছেন বলে অনুমান করি। মাত্র আটখানি রেকর্ডের পক্ষে এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে গলাবাজি, যা এমনিতেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণে বেশ কার্যকরী হয়ে থাকে, তা সুরাশ্রিত হয়ে আক্রমণ করলে মানুষের মনের পক্ষে গা ঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করবার আর কোনোই পথ থাকে না।

বস্তুত এরই নাম প্রচার। প্রচারের মূলমন্ত্রই হচ্ছে তারস্বরে বারংবার নিজেকে এবং নিজের গুণপনাকে ঘোষণা করা। যে ফিরিওয়ালার গলা যত চড়া তার বিক্রি তত বেশি। বারবার উঁচু গলায় জোর করে যা বলা যায় তা কেবল লোকের মনোযোগ নয় প্রতীতিকেও আকর্ষণ করে। মিথ্যাকেও যে এভাবে সত্য বলে চালানো যায়, তা যুদ্ধকালীন প্রচারকার্যের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন।

অতএব চায়ের দোকানের মালিক মহাশয় তাঁর ব্যবসার স্বার্থে উচ্চরবে দোকান প্রতিষ্ঠার সংবাদ প্রচারে সম্পূর্ণ অধিকারী।

সে সম্বন্ধে কোনোরূপ আপত্তি প্রকাশ করা চলে না। আমার আপত্তি শুধু এই যে, প্রচারকার্যের জন্য যখন উচ্চরবই মাত্র প্রয়োজন, সুর ছন্দ ইত্যাদি যখন এ কাজে অত্যাবশ্যক নয়, তখন এ ব্যাপারে সঙ্গীতের মত একটি উঁচুদরের ললিতকলাকে টেনে না আনাই ভালো। কেননা, আমার নিজের কথা বলতে পারি, এই আটখানি গ্রামোফোন রেকর্ডের আঘাতে মনটা এখনও এরূপ গুরুতররূপে জখম হয়ে আছে যে, জীবনে যে আর কখনো সঙ্গীত শোনবার স্পৃহা হবে এরূপ মনে হচ্ছে না।

প্রকৃতই, ললিতকলাকে প্রচারকার্যে ব্যবহার করবার এ এক গুরুতর বিপদ। বিবিধ পণ্যের বিক্রেতারা খবরের কাগজে, ছায়া-চিত্রের স্লাইডে এবং রাজপথের পাশে বড় বড় ছবি সমন্বিত বিজ্ঞপ্তিতে নিজ পণ্যের গুণপনা প্রচার করেই যথেষ্ট সুফল পেতে পারেন। নাম ও পণ্যের প্রচারের জন্য বহুপ্রকার উপায়ই বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে যা প্রচারশাস্ত্র-সম্মত। তবু সেই সব উপায়কে উপেক্ষা করে অনেকেই যদি নিজের বা নিজপণ্যের প্রচারকার্যের জন্য ললিতকলার শরণাপন্ন হন, তাহলে কিছুদিনের মধ্যে লোকে ললিতকলা সম্বন্ধেই বীতস্পৃহ হয়ে উঠতে পারে একথাও ভেবে দেখা দরকার।

আমেরিকা প্রমুখ আধুনিকতায় নেতৃস্থানীয় কোনো কোনো দেশে ইদানিং ললিতকলাকে ব্যবসায়ের প্রচার-কিংকর রূপে নিয়োজিত করবার প্রচেষ্টা চলেছে, এবং সে-সব দেশে এ চেষ্টা যে বহুলাংশে সফল হচ্ছে না একথাও বলা চলে না। ব্যবসায় প্রচারে চারু ও কারুশিল্পের মজুরদের সঙ্গে সেখানে সর্বদাই ফুরন দরে কাজ-কারবার

চলে। হুঁশিয়ার মালিকের কড়া তত্ত্বাবধানে ললিতকলাকে কখনো কখনো কলা থেকে কদলীতে পরিণত হতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তবু এতে উভয় পক্ষেরই লাভ। কেন না, একদল উপোসী বা আধা-উপোসী লোকের যে পেট ভরে আর আরেক দল ভরপেট লোকের যে ভুঁড়ি বাড়ে সেটাই বা মন্দ কী ?

সভ্যতায় অত্যাধুনিকতাগর্বী সেই আমেরিকা দেশে ব্যবসায়ের বশংবদরূপে ললিতকলার ব্যবহার বিস্তৃত ও ব্যাপক। সেখানে বেতারানুষ্ঠান ব্যবসা হিসাবে পরিচালিত হয় বলে তার মাধ্যমেও পণ্য-প্রচারে বাধা নেই। সেদেশে বেতার, ছায়াচিত্র প্রভৃতি আধুনিক জনপ্রিয় শিল্পগুলির মধ্য দিয়ে নামজাদা শিল্পীদের সহায়তায় এরূপ সুকৌশলে ও মনোমুগ্ধকররূপে প্রচার চালানো হয় যে সাড়ে পনেরো আনা লোকই তা আগ্রহ সহকারে দেখে ও শোনে, আর বাকি আধ আনা লোক সেটা পছন্দ না করলেও সহ্য করতে পারে।

আমাদের দেশেও এ জাতীয় প্রচারের ছিটে ফোঁটা দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাকে অতি প্রচ্ছন্নরূপেই দাবিয়ে রেখেছে, উগ্ররূপে প্রকট হয়ে উঠতে দেয়নি। জাতিগত শুচিবাই এক্ষেত্রে আমাদের অনেকটা বাঁচিয়ে দিয়েছে বলতে হবে। এ দেশে এখনো পণ্যপ্রচারে সাহিত্যের নিয়োগ বলতে গেলে বিজ্ঞাপনের কপিতেই সীমাবদ্ধ। অন্যভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যিককে প্রচারের কাজে লাগাবার যেটুকু চেষ্টা এদেশে হয়েছে, তাতে সাহিত্যিকরা অসংকোচে এগিয়ে এসে যোগ দিয়েছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

রেলের কামরায় পাঁচ আঙ্গুলে চারটে মলম কিংবা হজ‌্মিগুলির কৌটো উঁচু করে ধরে যে গায়ক তার অত্যাশ্চর্য গুণসম্পন্ন পণ্যের প্রশংসাবাচক গান শুরু করে, কিংবা রাস্তায় রাস্তায় বিজ্ঞাপনের টুপি মাথায় দিয়ে যারা নেচে গেয়ে বেড়ায়, তাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীত-সাধক সম্প্রদায়ের কোনোই যোগ নেই। সেজন্য এ জাতীয় জিনিস নিষ্ঠাবান ললিতকলাসেবী ও সঙ্গীতরসিকের মনঃপীড়ার কারণ হয় না। কিন্তু যে গানে কোনো উৎকৃষ্ট শিল্পীকণ্ঠের সুরজালের মধ্য দিয়ে নিকট কিংবা দূরবর্তিনী প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদিত হচ্ছে, সে গানকে চায়ের কিংবা জুতোর দোকানের প্রচারে নিয়োজিত করলে শিল্পসাধক ও শ্রোতা সকলেরই সেটা দুর্বিষহ মনে হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুত ললিতকলার এরূপ নির্বিচার ব্যবহারের সঙ্গে ‘লাউড্‌স্পীকার’ নামক বীভৎস যন্ত্রটির সংযোগ অধুনা আমাদের জীবনে এক ঘোরতর অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২

প্রচার ও ললিতকলা

যদিও প্রচারশিল্পের সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের, তবু প্রচারের কলাকৌশল আয়ত্ত করে সাহিত্যেকেরা যেরূপ দক্ষতা সহকারে তাকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত বা দলীয় উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োগ করেছেন, এরূপ অন্যকলাবিদ্‌রা এখনো পেরে ওঠেন নি। কী নিজের, কী নিজ গোষ্ঠীর, কী নিজ উপদলের, কী নিজেদের মত ও কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রচারে সাহিত্যের বৃহত্তর অংশ অধুনা এরূপ তারস্বরে কোলাহল করে চলেছে যে এর মধ্যে সাহিত্যের মূল ও অদ্বিতীয় মানবতার সুরটি কান পেতে শোনাই মুস্কিল। কেবল প্রবন্ধ পুস্তিকা ও পুস্তক নয়, গল্প উপন্যাস, এমন কি কবিতা পর্যন্ত প্রচারের আরকে ডুবিয়ে জনগণহিতকারী করে তোলার চেষ্টার কোনো বিরাম নেই। নিতান্ত আত্মপ্রচার ও গোষ্ঠীপ্রচার বাদ দিলেও সাহিত্যে প্রচারিত এই সব মত ও তত্ত্বের মধ্যে এমন কিছু গূঢ় ও অজ্ঞাত বস্তু থাকে না, যা সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানেন না বা ভাবেন না। বস্তুত এ সব তর্কযোগ্য বিষয়ের অধিকাংশের সম্বন্ধেই শিক্ষিত ও রসজ্ঞ পাঠকের নিজস্ব বিচার ও চিন্তাপ্রসূত একটা সুগঠিত মত আছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কথাই ধরা যাক। এ জাতীয় কাব্য-উপন্যাস-গল্পে প্রচারিত মতবাদ বা কর্মপন্থার সঙ্গে যে

সর্বদাই আমার মতামতের কোনো বিরোধ থাকে তা নয়। বস্তুত আমার সামান্য জ্ঞান বিদ্যা ও বুদ্ধি অনুযায়ী যে সব মতামত আমি পোষণ করি কখনো কখনো তার সঙ্গে সাহিত্যে প্রচারিত এই সব মতামতের অনেকখানিরই মিল আছে দেখতে পাই। কিন্তু আমি যখন সমাজ কিংবা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোনো তথ্য বা তত্ত্ব সংগ্রহ করতে চাই তখন তৎসংক্রান্ত গ্রন্থ ও সংবাদপত্রাদিই পাঠ করি। যখন কবিতা পড়ি তখন তার থেকে কাব্যরসই প্রত্যাশা করে থাকি। দুটোকে এক সঙ্গে মিশিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে না পাই তাতে স্বাদ, না উপকার। মিষ্টান্ন সুস্বাদু বলেই যে তাতে শরীরের পক্ষে হিতকর গুটি কয় উচ্ছে ফেলে দিলে তাও স্বচ্ছন্দে খাওয়া যাবে সেটা গুরুতর সন্দেহের বিষয়। পক্ষান্তরে তাতে শারীরিক উপকার কিছু হওয়া সম্ভব কিনা তাও গবেষণা ভিন্ন বলা শক্ত। এক্ষেত্রে আমি দুটোকে আলাদা আলাদা ভাবে গ্রহণ করারই পক্ষপাতী এবং আমার মতে পরিবেশনও সেইভাবে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আজকাল যেমন জগদ্ব্যাপী দুঃখদুর্দশা অসাম্য ও নিপীড়নের ফলে রাজনীতিই কর্মে ও চিন্তায় প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, এককালে তেমনি ছিল ধর্ম। এর গোঁড়ামি ওর গোঁড়ামির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু পূর্ববর্তী সাহিত্যেও সেইটুকুই সার্থক, যেটুকু দর্শন অথবা ধর্মের ক্ষীণ আবরণে ঢাকা থাকলেও স্বাভাবিক মানব আবেগের প্রকাশ। সে কারণে বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত ও বৈষ্ণব-পদাবলীকে আমরা সাহিত্য বলে গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু পদ্যে অর্থাৎ কাব্যের আঙ্গিকে লেখা হলেও ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র

অর্থশাস্ত্র ব্যাকরণ প্রভৃতিকে সাহিত্য বলা চলে না। অনুশাসন ও প্রচারবার্তা যদি সাহিত্যের আঙ্গিকে পরিবেশন করা হয়, তাহলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে ভোক্তারা সেই আঙ্গিকের সম্বন্ধেই বীতস্পৃহ হবেন। এ কারণে প্রায়ই দেখা যায় যে, শাস্ত্রজ্ঞ ও নীতিবিদ্ পণ্ডিতেরা আজীবন শ্লোক মুখস্থ করেও কাব্যের রস গ্রহণ করতে অপারগ ও পরাঙ্মুখ হয়ে থাকেন।

অবশ্য এ-কথা তো মানতেই হবে যে, সহিত্যের লক্ষ্য ও ধর্মই হচ্ছে প্রচার। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মুখে নীরব কবির কথা শোনা গেছে, এমনকি বাল্যকালে ঐ অজ্ঞাত এবং দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তিটির সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ আমাদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গতও ছিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে লিখতে অক্ষম কিন্তু চাঁদের পানে চক্ষু তোলা কোনো লোককেই আজ পর্যন্ত কবি নামের যোগ্য বলে মনে হয় নি। যে নিজেকে প্রকাশ ও প্রচার করতে অসমর্থ তার ভিতরে 'কবিত্ব' যদি কিছু থাকে, তবে সে সেটুকু কবিতার উপলব্ধিতে প্রয়োগ করলেই যথেষ্ট। তাহলেই তাকে আমরা কাব্য-রসিক বলে অভিনন্দিত করতে পারি, সেটাও তার পক্ষে কম গৌরবের নয়। মানুষের অনুভূতি যখন মনে মনেই থেকে যায় তখন সেটা নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার। সে অনুভূতিকে কাগজে-কলমে শাদা-কালোয় লিপিবদ্ধ করলেই যে সেটা সাহিত্য হয়, তাও নয়। ছন্দোবদ্ধে কিংবা গল্পাকারে লিখিত রচনামাত্রই যে সাহিত্য হয় না একথা সাময়িক পত্রিকাদি পাঠ করলেই জানা যায়। তার মানে হচ্ছে, নিজেকে প্রকাশ করলেই হবে না, প্রচার করতে হবে। এমন করে লিখতে

হবে যে লেখকের অনুভূতি অনেকের অনুভূতিকে স্পর্শ করবে জাগিয়ে তুলবে, আলোড়িত করবে। তবেই লেখক কৃতার্থ। নিজেকে অপরের সঙ্গে যত বেশি একাত্ম করা যায়, নিজের অনুভূতি অপরের মনের যত গভীর স্তরে গিয়ে ঝঙ্কৃত হয়, ততই রচনা সার্থক। সাহিত্যের বিচারে ঐটেই একমাত্র মাপকাঠি। তাই যদি কেউ বড় বড় চুল রেখে, ঢুলু ঢুলু চক্ষে আকাশের দিকে তাকিয়ে খুব ভালো ভালো চিন্তা ও উচ্ছ্বাসময় ভাবের মধ্যেও ডুবে থাকেন, কিন্তু সে সব চিন্তা ও উচ্ছ্বাস ভাষায় প্রকাশ করে অপরের মনে সঞ্চারিত করতে না পারেন, তবে আমরা তাঁকে কবি বলবো কী করে? তাঁর মনের স্পর্শ তো আমরা পেলাম না। যদি নিজেকে বিস্তৃত প্রসারিত প্রচারিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য না হবে, তবে কেন কবির আক্ষেপ —

ইতর দুঃখশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

কেনই বা ভবভূতির অনাগত সমানধর্মার দিকে তাকিয়ে থাকা, আর কী হেতুই বা কবিগুরুর কালান্তর অতিক্রম করে শতবর্ষ পরের পাঠক-হৃদয়ের সম্বন্ধে কৌতূহল? রচনা শেষ হয়ে গেলেই তো লেখকেরা তৃপ্তি পেতে পারতেন। সাহিত্য সর্বদেশে সর্বকালে সর্ব-মনে নিজেকে প্রসারিত এবং মানব মনের সর্বপ্রকার অনুভূতি ও

আবেগকে স্পর্শ করতে চায় বলেই তার বিস্তার জগদ্ব্যাপী, যুগব্যাপী ও কালজয়ী।

কাজেই সাহিত্যের লক্ষ্যই প্রচার একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। একের অনুভূতি ও আবেগ বহুর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সে-অনুভূতি যদি সর্বমানবিক ও সর্বসাময়িক হয় এবং লেখক যদি তা নিপুণতার সঙ্গে প্রকাশ করতে সমর্থ হন, তবে অবশ্যই তা যুগে যুগে, দেশে দেশে বিভিন্ন মানুষের মনে সাড়া আনবে।

যদি তাই হয়, তবে আর আমরা প্রচার-প্রবণ বলে সাহিত্যের একাংশকে চিহ্নিত ও নিন্দিত করি কেন? তার কারণ, যা সর্ব-কালের সর্বমানবের উপলব্ধির সঙ্গে মেলে তার প্রচার মানে প্রোপাগাণ্ডা নয়, বিস্তার। বিধাতা যেমন বহুর মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেন, সাহিত্যস্রষ্টা তেমনি বহুর মনে নিজের মনকে ছড়িয়ে দেন। সে কারণে সাহিত্যিকের বক্তব্য যখন সর্বজনের অনুভূতিকে আশ্রয় করে তখনই তা সাহিত্য হয়; যখন মানবজাতির কোনো বিশেষ অংশের মতামত বা বক্তব্যের সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকে, তখন তা সাহিত্য হতে পারে না। মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, মানুষ ভয় পায়, হাসে, বীর্য প্রকাশ করে। আমরা মানব-ইতিহাসের যতটুকু জানি এবং যত দেশের মানুষ সম্বন্ধে জানি, তারা প্রত্যেকেই এই সকল স্বাভাবিক মানব-প্রবৃত্তির অধীন। কাজেই মানবের মজ্জাগত এইসব সহজ হৃদয়ের ধর্মকে নিজস্ব অনুভূতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ ও প্রচার

করলে তা সর্বকালের ও সর্বমানবের উপভোগ্য হয়। কিন্তু আমরা বিভিন্ন দোকান থেকে জিনিস কিনি, বিভিন্ন মার্কার চা খাই, বিধবা-বিবাহ থেকে আধুনিক শিক্ষা পর্যন্ত সর্বপ্রকার বিষয়ে বিভিন্ন মতামত পোষণ করি। এরূপ অবস্থায় সাহিত্যিকেরা প্রত্যেকেই যদি তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে নিজের নিজের মত ও পছন্দ প্রকাশ করাতেই সমস্ত নিপুণতা প্রয়োগ করেন তবে সেই মতাবলম্বীরা তার যতই তারিফ করুক, সেটা নেহাৎ-ই কয়েকজন লোককে কিছুক্ষণের জন্য খুশি করবার মত লেখার বুদ্বুদ বলেই গণ্য হবে।

রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতি সম্বন্ধেও সর্বমানবের মত ও ধারণা এক নয়। তাই বিশেষ কোনো রাষ্ট্রনৈতিক পন্থার গুণগানকেও সাহিত্য বলে গণ্য করা মুস্কিল। কিন্তু দেশাত্মবোধমূলক উৎকৃষ্ট রচনা সাহিত্য বলে স্বীকৃত হতে বাধা নেই। কেননা নিজের পরিবারকে ভালোবাসার মত নিজের দেশকে ভালবাসাও মানুষের একটি সহজ প্রবৃত্তি। তাই স্বদেশী গান ও কবিতার আবেদন সর্বমানবিক ও সর্বকালীন এবং তার শ্রেষ্ঠাংশ সাহিত্যে সমাদৃত। কিন্তু আমাদের দলের দ্বারা নির্দিষ্ট এই পথে গেলে দেশ জাতি বা পৃথিবীর মুক্তি হবে, একথা লিখে তাকে সাহিত্য বলে দাবি করা চূড়ান্ত মূঢ়তা ছাড়া আর কী?

৩

সাহিত্যে বাস্তবতা

অবশ্য এটা জাজ্বল্যমান সত্য যে আমরা এখন যে সময়ে বাস করছি সেটা নিরবচ্ছিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনায় সমাচ্ছন্ন। জগতের কর্তাব্যক্তিদের বৃহত্তর কর্তৃত্বলিপ্সা তো আছেই, তার উপর ভাগাভাগি, কাড়াকাড়ি, মারামারি, চুরি-চামারি, লোভ ও হীনতার গ্লানিময় পরিবেশে মনটাকে গুছিয়ে রাখাই এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। তবু ভেবে দেখতে গেলে মনে হয় সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে মনের কথার আলপনা কেটে চলাই একমাত্র পথ। চাল-ডাল-নুন-লকড়ির আক্ষেপের কথা একটানা বকে বা শুনে যাওয়াতে আপনার বা আমার কারুরই কোনো তৃপ্তি নেই। ওগুলো আমরা প্রত্যেকেই হাড়ে হাড়ে জানি। তথ্য হিসাবে, খবর হিসাবে অথবা নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে যা বলতে হয়, তা আমরা সকলেই সমস্বরে সর্বদাই বলে চলেছি। বর্তমানে রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার বহুল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হলেও এবং এ সম্বন্ধে সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে আমাদের মনে নানাবিধ দৃঢ়বদ্ধ ধারণা থাকলেও, তার প্রচারের জন্য সাহিত্যের শরণাপন্ন হতে হবে কেন? বরং সাহিত্যের পাঠক-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত স্বল্প এবং তারও একটা মোটা অংশ সাহিত্যের তাৎপর্য গ্রহণে অক্ষম বলে সাহিত্যকে কোনো

মতেই মত ও বাণী প্রচারের উৎকৃষ্ট মাধ্যম বলা চলে না। তার চেয়ে সাহিত্যের যেটা মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ নিজের ভাব ও চিন্তাকে সকলের সহিত গ্রহণ করা এবং নিজের আবেগকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, সেটাই ঢের ভালো। কেননা তাতে সাহিত্য যে সাহিত্যই হয় একথা নিশ্চিন্ত। অপরপক্ষে জনহিতকর বুলির সমাবেশ দ্বারা রচনা যে সাহিত্য কিংবা জনহিতৈষণা কোনো হিসেবেই উৎরোবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কাজেই যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায় এবং মানসিক গঠন, শিক্ষা ও রুচি যতক্ষণ খুব সংকুচিত ভাবে হলেও মনের কোণায় ইন্দ্রিয়াতীত উপভোগের একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে রাখে, ততক্ষণ নিষ্প্রয়োজন কিন্তু প্রীতিপ্রদ আলোচনার খোরাক দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাকে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বলে মেনে নেওয়া শক্ত।

বিশেষত একথা যখন নিঃসন্দেহ যে মানুষের জীবনের সমস্তটাই রাষ্ট্র সমাজ কিংবা জীবিকার্জনের গ্লানি দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এমন কোনো কুশাসন নেই, এরূপ কোনো নৃশংস সমাজ থাকতে পারে না, এমন কোনো মত ও পথ কিংবা কর্ম নেই যা মানুষের ব্যক্তিগত আবেগগুলিকে পরিপূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারে। সজ্জন কিংবা চোর, রাষ্ট্রদ্রোহী অথবা ভক্তপ্রজা, বিপ্লবী কিংবা সৈনিক, রাজা কিংবা মুটে, কে আছে এমন মানুষ যে তার সন্তানকে ও বন্ধুকে ভালো না বাসে, প্রেমাস্পদার স্বপ্নে মগ্ন না হয়, কিংবা প্রিয়জনের জন্য অযৌক্তিকরূপে গভীর স্বার্থত্যাগে এগিয়ে না আসে? এমন লোক কে আছে সুন্দর দৃশ্য, মধুর সংগীত, অপূর্ব কল্পনা যাকে

মুগ্ধ না করে ? প্রচণ্ড বিপ্লবীও কি তার সারাদিনের অতিকঠোর কর্মের বোঝা একজনের কাছে নামিয়ে মনের বিশ্রাম মনের ছুটি খোঁজে না ? হীনতম কেরানি কি বড়সাহেবের কাছে প্রচণ্ড বকুনি খেয়ে এসেও বাড়ি ফিরে ছেলেটিকে আদর করে না ?

ললিতকলা মানুষকে তার জীবনের কুশ্রিতা ও গ্লানিময় পরিবেশের মধ্যে থেকে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দের প্রেরণার আশার প্রোজ্জ্বল লোকে নিয়ে যায়। মানুষের মনকে সে পুনরুজ্জীবিত করে, তাই সুখে দুঃখে সেই মানবের বড় বন্ধু। এই জন্যই প্রাচীন বিজ্ঞরা বলেছেন যে সংসার যদি বিষবৃক্ষও হয় তবু তার দু'টি ফল আছে যা মানুষকে অমৃতের স্বাদ দেয়। তার একটা সাহিত্য, অপরটি সজ্জনসঙ্গ।

বস্তুত, সাহিত্যরসচর্চা হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটার কি খেলা দেখার মত মনের ছুটির ঘণ্টা। মানসিক গঠন শিক্ষা ও রুচি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে এই মন-বাঁচানোর চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হয় বটে, কিন্তু সকলেই চেষ্টা করে একটানা অপ্রীতিকর আবহাওয়ার থেকে একটুখানি ছাড়ান পেতে। এই জন্য বর্তমানে নানাদিক থেকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ঘা খেয়ে খেয়ে যতই দুর্বহ হয়ে উঠছে, ততই সিনেমা থিয়েটারে ভিড় বাড়ছে, খিস্তিখেউড়ের কাগজপত্রগুলির চাহিদা বেড়ে চলেছে এবং অন্য কিছুর অভাবে রাজা-উজির মারা বা পরনিন্দা পরচর্চা করার প্রবৃত্তি লোকের উদগ্র হয়ে উঠছে। কেননা জীবনের কঠোর ও দুর্বহ শাসন থেকে ঐখানেই মুক্তি। এমন কোন মানুষ বা প্রাণী আছে দুঃখকে যে এড়াতে চায় না, পালাতে চায় না চাবুকের আঘাত থেকে ? মানুষও সর্বদা সর্বত্র

তাই করে, সর্বযুগেই করেছে। প্রচণ্ড বাস্তববাদী বিপ্লবীও জেল থেকে পালায়, পালাতে চায় আসন্ন ফাঁসির থেকে। তাতে তার জাত যায় না।

কেবল দুঃখের দিনে নয়, সুখের দিনেও জীবনের সাধারণ পরিবেশ ও গতি সর্বদাই বিশেষত্ববর্জিত, ক্লান্তিমলিন ও গতানুগতিক। সেই জন্য সব সময়ই মানুষের মন কোনো-না-কোনো সময়ে, কোনো-না-কোনো উপায়ে প্রায়ই সংসার পালায়। খেলা করা, খেলা দেখা, সিনেমা-থিয়েটারে যাওয়া, পূজোয় বিয়েতে জন্মদিনে ফূর্তি করা ইত্যাদি বিষয়ে তাই তার এত উৎসাহ। লোকে যাকে 'এণ্টারটেইনমেণ্ট' 'রিক্রিয়েশন' ইত্যাদি নামে অভিহিত করে, সেগুলি বস্তুত সংসার পালিয়ে খানিকক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেবার ছায়ানিকুঞ্জ। যেন সদাব্যস্ত, সর্ব সময়ে কোলাহলক্লান্ত কলেজ স্ট্রীট কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে গোলদীঘি আর হেদুয়া। কাজ থেকে পালিয়ে সেখানে পুকুর পাড়ে আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা বসে জিরিয়ে নিলে তাতে সঙ্কোচ বা লজ্জার কোনো কারণ নেই, নিন্দিত হওয়ারও কোনো হেতু দেখা যায় না। অথচ দুঃখের বিষয় কাব্য-সাহিত্য-চিত্রকলা যখনই মানুষের মনকে সংসারের ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাঝখান থেকে সরিয়ে অতীন্দ্রিয়, কেবলমাত্র মানসগোচর সৌন্দর্য ও আনন্দলোকে নিয়ে যেতে চায়, আজকাল তৎক্ষণাৎ আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে গাল দিয়ে বলে উঠি রোমাণ্টিক, প্রতিক্রিয়াশীল, সমাজ-অচেতন।

কল্পনা-কালিন্দীতে অবগাহন করতে সবাই পারে না, খুব কম সংখ্যক সাহিত্যিকের রচনাতেই উল্লেখযোগ্য কল্পনা-শক্তির পরিচয়

পাওয়া যায়। যদি কোনো সাহিত্যিক অতি দুর্দিনেও তাঁর দুর্লভ কল্পনা দ্বারা সৌন্দর্য ও আনন্দের মনোহর ছবি এঁকে নিজেকে এবং অপরকে কিছুক্ষণের জন্যও আনন্দলোকের রসাস্বাদন করাতে পারেন তবে আমরা কেউ কেউ সে আনন্দ আস্বাদনে পরাঙ্‌মুখ বলেই যে শিল্পীকে গালাগাল করতে অগ্রসর হতে হবে, এটা প্রকৃতই অন্যায় ও অবিচার। পরমহংসদেব যে মেছুনীদের কথা বলেছিলেন তাদের মত আমরা অনেকেই মাছের আঁশটে গন্ধ মাখানো চুবড়ি নাকের কাছে না রেখে থাকতে পারি না বলে আপনি যদি চাঁদের আলোয় সুরভিত ফুলবাগানে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসেন তাতে আমাদের ঈর্ষ্যা বা নিন্দা করবার কোনো কারণ নেই। উপযুক্ত আগ্রহ ও প্রবৃত্তি থাকলে আমরা প্রত্যেকেই সেই উপভোগ আহরণ করতে পারি। সেরূপ প্রবৃত্তি আমাদের নেই বলেই যাঁদের আছে তাঁদের মুণ্ডুপাত করবো কেন?

বাস্তবিক, দুঃখে জর্জরিত হয়ে মানুষ আজকাল এমনি বিকৃত-বুদ্ধি হয়েছে যে, যে-ব্যক্তি তার মনের থেকে বিষাক্ত বাষ্প দূর করে একটু আনন্দ দিতে চায়, তাকেই সে আঘাত করে। আরে মশাই, যে অত্যাচারে অনাচারে অবিচারে আপনি ক্ষেপে যাচ্ছেন, খোঁজ করে দেখবেন তার আঘাত ঐ সৌন্দর্য্য-পরিবেশককেও জর্জরিত করছে আপনার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়, হয়তো বা বেশি। কিন্তু তবু তো সে সুন্দর ছবি আঁকে, সৌন্দর্যের গান গায়। নিজের এবং আপনার-আমার জীবনে একটু আনন্দের হাওয়া এনে দেবার জন্যই সে তা করে।

৪

সাহিত্যে জনপ্রিয়তা

শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে তিন জাতের লোকই সচরাচর চোখে পড়ে। এক যাঁরা সাধারণের স্তর থেকে নিজেদেরকে ঊর্ধ্বে অসাধারণতার উত্তুঙ্গ চূড়ায় তুলে নিতে চান; দ্বিতীয় যাঁরা সকলের মনের সঙ্গে সেতু গড়তে চান তাঁদের সত্য আবেগের সুষ্ঠু রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, অপর একদল যাঁরা অন্যের মনের গতির সঙ্গে তাল রেখে লিখে সহজে সকলের তারিফ পেতে চান। একদল অপরের বিস্ময় ও সমীহ অর্জন করাই তাঁদের রচনার চরম লক্ষ্য বলে করেন; আরেক দল নিজেদের মানস-লোককে তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত করে অপরের প্রীতি অর্জন করতে চান এবং তৃতীয় দল সবচেয়ে সহজে লোকের মন-রাখা কথা বলে বিনা সাধনায় সাহিত্যিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শিখরে উঠতে চান। যাঁরা দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লেখক ও শিল্পী সমসাময়িককালে প্রথম গোষ্ঠীর কাছ থেকে তারা চিরকালই অনুকম্পা ও অবজ্ঞা পেয়ে থাকেন, এবং তৃতীয় গোষ্ঠীর থেকে পান অনুকম্পামিশ্রিত বিদ্রূপ। ভাবখানা এই, 'অত নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক হতে গিয়ে তোমার কি অবস্থা হোল দেখলে তো? এখন আমরা একটু পিঠ চাপড়ে না দিলে আর দাঁড়াতে হয় না।' কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। কেননা, যদিও খ্যাতি সর্বদাই লোভনীয়, তবু শিল্পস্রষ্টা মাত্রই

জানেন যে, সমসাময়িক খ্যাতির দ্বারা শিল্পোৎকর্ষের প্রকৃত বিচার হয় না। যে-শিল্পস্রষ্টা নগদ দাম পাবার লোভে তাঁর রচনাকে সমসাময়িক চাহিদা অনুযায়ী গড়তে চেষ্টা করেন তিনি শিল্পীসমাজে পতিত। তাঁর ভাগ্য ঈর্ষ্যা করবার মত নয়।

আসলে সমসাময়িক পছন্দের হাওয়া যে কতক্ষণ কোন দিক থেকে বইবে, তা যখন কিছুতেই সঠিক বোঝবার উপায় নেই, তখন চিরকালের দিকে তাকিয়ে শিল্প-সৃষ্টির চেষ্টা করাই ঢের ভালো। সমসাময়িক কালকে চেনাই তো দুরূহ। তার চেহারা, পছন্দ, রুচি ও মত ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে। যদি কোনো সতেরো কি আঠারো বছরের উচ্চাভিলাষী যশঃপ্রার্থী নবীন লেখক সমসাময়িক কালের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী নিজের রচনাকে তৈরি করে নাম কিনতে চায়, তবে দেখা যাবে যে, ক্রমাগত তালিম দিয়ে তার রচনা যখন একটা বিশেষ ভঙ্গি ও ধরণ আয়ত্ত করেছে, তখনকার সমসাময়িক পছন্দ আর সে ভঙ্গি সে ধরণ পছন্দ করছে না, তার মোড় ঘুরে গেছে অন্য দিকে। আজ থেকে পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে তৎকালীন সমসাময়িক সাহিত্যে যে সব বই খুব নাম কিনেছিল, আজ তাদের অনেকেই বিস্মৃত বা অর্ধ-বিস্মৃত। ১৯৪৩-৪৪ সালের পছন্দের হাওয়ায় যারা সাহিত্যের তরী ভাসিয়েছিল, তাদের অনেককেই সমসাময়িক জনমনের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে দু-তিনবার মোড় ফিরতে হয়েছে। খ্যাতি যতই লোভনীয় হোক, দিনকে দিন হাওয়া মোরগের মত লোকের মন জুগিয়ে জুগিয়ে লেখা বড়ই ঝঞ্ঝাট। আর সেটা নিতান্ত সহজ বলেও মনে করা যায় না।

আজকাল যে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা কমে গেছে, কয়েক বছর আগেকার অতি-মুখর সাহিত্যিকেরা যে এখন অপেক্ষাকৃত নীরব রয়েছেন, আগে যে সব সাহিত্যিককে লোকে মাথায় নিয়ে নেচেছে, তাঁদের প্রতিপত্তি যে এখন ক্ষীণ, তার কারণ সমসাময়িক পছন্দের ক্রমিক পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। ১৯৪১-৪২ থেকে ১৯৪৮-৪৯ সাল পর্যন্ত লেখকদের হাতে পাঠকের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করবার মত অনেকগুলি বিষয় ছিল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বামপন্থা, ’৪২ সালের বিপ্লব, আজাদ হিন্দ ফৌজ ইত্যাদি জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে ইতিহাস, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কী না গাদা গাদা লেখা হয়েছে! দেশ ও দশের নামে কান্না ও রাজনৈতিক উত্তেজনা এই দুই মশলা মিশিয়ে একদল সাহিত্যিক যে অপরূপ ঘণ্ট রেঁধে চলেছিলেন, অনেকদিন পর্যন্ত অধিকাংশ লোকের কাছেই সেটা বেশ মুখরোচক বলে মনে হয়েছে। ফলে এই সব লেখকদের খ্যাতি আর এসব লেখার কাটতি দুটোই হু-হু করে করে বেড়ে চলেছিল। কিন্তু এখন মনে হয়, পাঠকসাধারণের মধ্যে সাহিত্যিক পছন্দের মোড় ঘুরেছে। লোকে ঘরোয়া কথাবার্তাই যেন শুনতে চাইছে। যদিও আজকের মানুষের ঘরের কথায় আর অন্তরঙ্গ জীবনেও রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আলোড়নের ছোঁয়া লেগেছে, তবুও সেই অবিন্যস্ত বিশৃঙ্খল নীড়ের দিকেই যেন আজকের মানুষের চোখ ও মন ফিরেছে। মানুষ যে আর যুদ্ধবিগ্রহ, অশান্তি-উপদ্রব, কলহ-কলরব চায় না, নিজস্ব জীবনের শান্তিতে ফিরে যেতে চায়, এ তারই লক্ষণ। সত্যি কথা বলতে কী, রাজনীতি সমাজতত্ত্ব স্লোগান ও বোমার হুজুগে হাবুবুডু

খেয়ে অনেকেই এখন এমন ঝালাপালা হয়েছে যে, এখন একটু গালগল্প, হাসির কথা, প্রেমের কথা শুনতে পেলে তারা বাঁচে।

সাহিত্যে এই যে একটা হাওয়া এসেছিল, যেটা যাই-যাই করেও এখনো যাচ্ছে না, এর মত সংবাদপত্রের ধামাধরা সাহিত্য কল্পনা করাই শক্ত। 'আবেগময়ী' 'জ্বলন্ত' ভাষায় সংবাদপত্রের তাড়া সামনে নিয়ে (কেননা উপন্যাস হোক গল্প হোক, ঘটনার পারম্পর্য তো রাখতে হবে) কোনো কোনো সাহিত্যিক নিজেদের জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রহীন যে সাহিত্য তৈরি করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, সেগুলি পড়ার চাইতে খবরের কাগজ পড়ে সন্তুষ্ট থাকা ঢের বেশি বুদ্ধিমানের কাজ।

এসব জিনিস লেখা হয়েছে এবং আরো লেখা হোক, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। সাধারণ লোকে উত্তেজনাপূর্ণ লেখাই পড়তে চায় — তা সে উত্তেজনা যা নিয়েই তৈরি হোক। আমার আপত্তি, এ সব লেখাকে সাহিত্য বলে চালাবার চেষ্টা কেন? সাহিত্য পাঠে লোকে ক্রমাগত রাজনীতি, সমাজ নীতি, দরিদ্রের প্রতি কর্তব্য, রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির ও ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে চায় না। অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই এসব বিষয়ে পড়াশুনো ও চিন্তা করে থাকেন এবং এসব বিষয়ে তাঁদের অনেকেরই নিজস্ব মতামতও আছে। চতুর্দিক থেকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সকলের কাছেই যদি কেবল হিতোপদেশ ও শিক্ষার খোঁচা খেয়ে চলতে হয়, তবে তো জীবন দুর্বহ। মাঝে মাঝে নিছক আনন্দের স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করে গা জুড়িয়ে, মন জুড়িয়ে নেওয়াও দরকার।

৫

প্রগতিশীল সাহিত্য

ক'দিন ধরে একগাদা পুরোনো বাঁধাই করা প্রবাসী ভারতবর্ষ মানসী-মর্মবাণীর পাতা ওল্টাচ্ছি। অনেককাল আগেকার পড়া গল্পগুলোই আবার চোখ বুলিয়ে দেখছিলাম। সেকালের সহজ আত্ম-তৃপ্ত জীবনের নিস্তরঙ্গ পরিবেশে লেখা মন ভোলানো ভারি মিঠি মিঠি গল্প সে সব। ধরুন মেসে থেকে ছেলেটি বি-এ পড়ে, পাশের বাড়িতে কিংবা বন্ধুর বাড়িতে কোনো মেয়েকে দেখে প্রেমে পড়ে গেল। কলেজে-পড়া ছেলে, তখনকার দিনের মাপকাঠিতে সব দিক থেকে উত্তমরূপে বিবাহযোগ্য। পাশ করলেই ডেপুটিগিরি, পাশ না করলেও বড় বড় চাকরি তো হাতের পাঁচ। জমিদারীর নির্ঝঞ্ঝাট আয়ও মন্দ ছিল না। বয়সও বিস্তর — আঠারো উনিশ কি কুড়ি। এরূপ ক্ষেত্রে প্রেমে পড়লে খুব গোঁড়া সমাজও কিছু মনে করতে পারে না — বিশেষত যে ক্ষেত্রে প্রণয় চোখের দেখার চেয়ে আর বেশিদূর অগ্রসর নয়। তারপর প্রেমের আগুনে দগ্ধ হয়ে যুবকটি যখন আত্ম-হত্যার বিষয় বিবেচনা করতে শুরু করেছে তখন দেখা গেল জাতি গোত্র ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে যুবকটির সঙ্গে মেয়েটির পয়লা নম্বর মিল। এমনকি মেয়েটির অভিভাবকগণ তরুণটির মাতা-পিতার সর্বপ্রকার দাবি মেটাতেও প্রস্তুত। এক্ষেত্রে বিবাহে আর বাধা কী? কিংবা ধরুন, রেল-গাড়িতে কিংবা অন্য কোথাও কোনো

একটি মেয়েকে দেখে একটি তরুণ গুরুতরভাবে প্রেমাহত হয়ে যখন গেরুয়া ধারণ করার উপক্রম করেছে, তখন হঠাৎ মার গুরুতর অসুস্থতার টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ি গিয়ে দেখতে পেলো তারই বিয়ের ব্যবস্থা করে তাকে কৌশলে ডেকে আনা হয়েছে। অতঃপর মনের দুঃখ মনে চেপে বিয়ে করতে বসে শুভদৃষ্টির সময় সে আবিষ্কার করলো যে, এই কনেটিই হচ্ছে তার সেই প্রেমে পড়া মেয়ে। এইরূপ অদ্ভুত সমস্ত মনোমুগ্ধকারী অথচ অভাবনীয় coincidence-পূর্ণ মিষ্টি গল্প। কোনো ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নেই, আঘাত-অপঘাত নেই, সেই গল্প পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে সুখ-স্বপ্ন ছাড়া আর কোনো স্বপ্ন আসতেই পারে না।

আপনি আমি এ-সব গল্প এখন পড়ে হাসাহাসি করতে পারি, কিন্তু তখনকার পাঠকেরা এ-সব গল্প-উপন্যাসের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ জানায়নি, বরং ভালোবেসে পড়েছে, একথা ভুলবেন না। তখনকার লেখকদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য ও শক্তিশালী তাঁরা অনেকে বাধ্য হয়ে বিদেশী সমাজ নিয়ে গল্প লিখেছেন, নতুবা সামাজিক জীবনের বাইরেকার বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছেন। দুঃসাহসিক লেখকেরা অন্যরূপ গল্প লিখতে গিয়ে বহু সমালোচক ও পাঠকের নিকট বিরাগভাজন হয়েছেন এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

এই গল্পগুলি পড়তে পড়তে ইদানিংকার বহু উচ্চারিত 'সমাজ-চেতনা' কথাটির সম্বন্ধে ভাবছিলাম। 'সমাজ-চেতনা' এমন একটি বস্তু যা না থাকলে কথা-সাহিত্যিক বড় হতে পারে না, একথা মূলত

সত্য হলেও তার উপর অধুনা বিকৃতবুদ্ধি ও নির্বুদ্ধির এমন একটি পুরু আস্তরণ পড়েছে যে, ঐ শব্দটাই আজকাল ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'সমাজ-সচেতন' ছিলেন না কেননা তিনি চাষী-মজুর ও তজ্জাতীয় অন্যান্য 'সর্বহারাদে'র জীবনের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে লেখেন নি, এমন কথাও শুনতে এবং ছাপার অক্ষরে পড়তে হয়েছে! এর চেয়ে দুর্ভাগ্য জীবনে অল্পই ঘটে।

আসলে সাংসারিক জীবনের দুর্দশার পেষণে, প্যাম্ফলেট ও স্লোগানের মারাত্মক প্রভাবে এবং আধুনিক কালের প্রচার-কৌশলে আজকের সামাজিক প্রয়োজনকেই আমরা চিরন্তন বলে মনে করছি। আজ জাগতিক ও জাতীয় প্রয়োজনে আমাদের সমাজবিধি ও সামাজিক সংস্কারগুলির আমূল পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে বলে আমরা কেবল আমাদের পূর্ববর্তী সমাজনেতাদের নয়, পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধেও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছি। ভুলে যাচ্ছি যে, গতকাল এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়নি বলেই সাধারণ স্তরের সাহিত্যে এর কোনো পরিচয় পাওয়া দুষ্কর ছিল। আজ যেমন অতি মাঝারি কিম্বা তার চেয়ে নিচু জাতীয় লেখকরাও 'সমাজ-চেতনা'র মশলা মিশিয়ে গদ্য পদ্য লিখে 'নাম' করে নিচ্ছে, তখনও তেমনি মাঝারি স্তরের সাহিত্যিকেরা মিঠে-মিঠে সমাজ-অনুমোদিত প্রেমের গল্প লিখেই 'নাম' করতেন। যখনকার যা চাহিদা, যখনকার লোক যেমনটি চায়। আজ যারা 'সর্বহারা'-সাহিত্যের নামে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রকে নস্যাৎ করে দিতে অগ্রসর, তাদেরই

বাপ-পিতামহ এই সব নমস্য লেখকদের বিরুদ্ধে লাঠি উঁচিয়েছিলেন এঁরা বড় বেশি সমাজ-সচেতন ছিলেন বলে। এমনি হচ্ছে কালচক্রের পরিহাস!

আমাদের জাতীয় জীবনে এমন সময়ও ছিল, যখন এই সমাজ — যে সমাজকে আমরা সঙ্গতভাবেই আজ আর দু'চক্ষে দেখতে পারি না — এর কোনো কোনো আচার, সংস্কার, নীতি ও রীতিকে হয়তো অব্যাহত ও অটুট রাখবার প্রয়োজন ছিল। তখনকার সাহিত্যিক সেকালের সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে তাল রেখেই লিখতেন। তাতে তাঁদের জাত যায়নি। বড় সাহিত্যিকের রচনাতে সর্বযুগেই আমরা পাই অগ্রসরমান মনের পরিচয়। বড় সাহিত্যে পাই, মানুষের নিবিড়তম সুখদুঃখের ছবি। মহাভারতের যুগে তাই মহাভারত সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল সাহিত্য, রামায়ণের যুগে রামায়ণ। তেমনি মাইকেলের যুগে মাইকেল, বঙ্কিমের কালে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের যুগে রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক সমাজ-সচেতন ও প্রগতিশীল সাহিত্যিক। যুগধর্মে সাহিত্যের বিষয়বস্তু, ধাঁচ ও চিন্তা আপনিই বদলায়। সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাহিত্যকে যিনি যতখানি সাহিত্যপদবাচ্য করে তুলতে পারেন, তিনি তত বড় সাহিত্যিক। আজ যদি কেউ সেই সেকেলে মাসিক-পত্রিকার ধাঁচে গল্প লেখে তবে সেটা গল্পই হবে না। কারণ আজকের জীবনের সঙ্গে সে জাতীয় সমাজ, চিন্তা ও আশা-আকঙ্ক্ষার কোনোই যোগসূত্র নেই। ভালো সাহিত্য বল্লেই বোঝা যায় যে তা সমাজ-জীবন থেকে রস আহরণ করেই বড় হয়েছে।

৬

অসাধারণত্ব ও উন্নাসিকতা

বর্তমান কালে সংস্কৃতি-পরায়ণতার লক্ষণ হচ্ছে সর্ববিষয়ে সাধারণ ত্যাগ করে অসাধারণতার দিকে চলা, সহজ বুদ্ধি ছেড়ে জটিল বুদ্ধির গোলকধাঁধার সরু গলিতে ঘুরে মরা। যে-কোনো ক্ষেত্রে যে-কোনো বিষয়কে সহজ সরল সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা না করে অসাধারণ বুদ্ধি দ্বারা তার গূঢ় তাৎপর্য আবিষ্কার ও প্রচারে আজকের মানুষের কোনো জুড়ি নেই। কী রাজনীতি, কী সমাজনীতি, কী সাহিত্য, কী শিল্পকলা, কী ব্যবসাদারি আর কী ঘর-গৃহস্থালি, সবটাতেই সাধারণ ও সহজ পথটা বর্জন করে চলতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। এজন্যই বিভিন্নক্ষেত্রের কোনো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির কার্যকলাপ ও বক্তব্য সব আমাদের বোধগম্য হতে চায় না। আমাদের মত সাধারণ লোক — যারা সামান্য একটু সাধারণ বুদ্ধি সম্বল করে জীবন কাটাবার ভরসা করি, আমাদের কাছে আজকালকার রাজনীতি অর্থনীতি সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বহু মত, উক্তি ও নির্দেশ অর্থহীন ও যুক্তিহীন বলে মনে নয়। আমাদের অনেকেরই ধারণা যে, আমরা আজকাল এক উন্মত্ত পৃথিবীতে বাস করছি। সে পৃথিবী যে শুধু হিংসায় উন্মত্ত তা নয়, অহিংসায়ও উন্মত্ত ; শুধু অর্থোপার্জনের নেশায় মাতাল নয়, অর্থ ধ্বংসের নেশাও তার প্রবল, শুধু সম্পূর্ণ মৌলিক ও অভূতপূর্ব নতুন ধরণের রসসৃষ্টির-

ঝোঁকে সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য নয়, যা কিছু প্রাচীন, মৃত, অব্যবহার্য, অসুবিধাজনক ও নিষ্প্রয়োজন তার পুনরুজ্জীবনের নেশাতের সে দিগ্‌ভ্রান্ত। একদিকে আমরা একীভূত জগতের নামতা আওড়াচ্ছি, অপরদিকে প্রত্যেক দেশকে টুকরো টুকরো করে কেটে হিংসার রক্তবীজের গুষ্ঠি বাড়িয়ে চলেছি। একদিকে সকল মানুষের সমান অধিকারের ঝাণ্ডা নাচাচ্ছি, আর একদিকে সেই ঝাণ্ডার বাড়িতে অ-নিজদলীয় সকল লোকের মাথা ফাটাবার চেষ্টায় আছি। মুখে বড় বড় প্রাচীন লেখক ও শিল্পীদের নাম আওড়াচ্ছি আর সমসাময়িক যুগের লেখক ও শিল্পীদের সৃষ্টিতে প্রাচীন ঐতিহ্য কিংবা বোধগম্যতার বিন্দুমাত্র পরিচয় পেলে নাসিকা কুঞ্চিৎ করছি। অসাধারণত্বের নেশায় এর চেয়ে বেশি উন্মত্ত হবার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই এবং আশাকরি আর ফিরেও আসবে না।

সর্ববিষয়ে সাধারণত্ব বর্জন করবার এই মনোবৃত্তির পিছনে নিজেদের দৈন্য লুকোবার চেষ্টাটাই যেন উৎকটরূপে পরিস্ফুট। আজকের এই অসাধারণতা লাভের উগ্র চেষ্টার কারণ, আমার মনে হয়, পৃথিবী ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাঝারি লোকের প্রতিপত্তি। জগতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব যে আজকাল মাঝারি ধরণের লোকদের হাতে চলে গেছে, পৃথিবীর বর্তমান চেহারা দেখলেই সেটা অনুমান হয়। কাব্য-সাহিত্য-দর্শনের মহীরুহরা যতই গত হচ্ছেন, ততই উৎকট, দুর্বোধ্য উন্নাসিক সাহিত্য ও সাহিত্যিক মতের প্রতিপত্তি বাড়ছে। মানুষের প্রতিভার দীপ্তি যতই নিষ্প্রভ হয়ে

আসছে, উদ্ভটতার দেশলাই জ্বেলে সে ততই তার ক্ষীয়মাণ আলোটুকু বেশি করে দেখাতে চেষ্টা করছে।

এক্ষেত্রে যে সব লোক স্বাভাবিক ও সাধারণ জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দেয়নি, তাদের পদে পদেই বিপদ। কী ঘরে, কী বাইরে, কী দেহে, কী মনে, কোথাও তাদের আনন্দ ও তৃপ্তির খোরাক নেই। তৃণগুল্মের রাজ্যে এরণ্ডরা সবাই যদি ভেরেণ্ডাকেই জগতের শ্রেষ্ঠ দ্রুম বলে প্রচার করতে থাকে, তবে আর অশোক শিমুল কৃষ্ণচূড়া, আম জাম লিচুর স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কী করে?

কবিতার কথাই ধরুন। যে হতভাগ্য এখনো ছন্দ মিল রেখে পদ্য লেখে, কবিতার আধুনিক পাণ্ডাদের বিচারে তার চেয়ে অবজ্ঞেয় জীব আর কে আছে? যার কাব্যরচনা বোধগম্য তার মত 'অসার্থক' কবি কে কোথায় দেখেছেন? আধুনিক কাব্য-সমালোচকেরা তার রচনাকে লগি দিয়েও ছোঁবেন না। যে-মূর্খ প্রেমের কবিতায় বিন্দুমাত্র আবেগ সঞ্চার করতে চায়, সে তো 'রোমান্টিক,' — আধুনিক সমালোচকের অভিধানের সবচেয়ে তীব্র গালাগাল। যদি কেউ সুন্দর সুস্থ জীবনের স্বপ্নকে ঘিরে কাব্য রচনা করে, তবে সে বুর্জোয়া। এমন কি যদি কেউ কবিতার মত করে কবিতা পড়ে, তাহলে সে-ব্যক্তিও বেরসিক ও আধুনিক কাব্যপাঠের অযোগ্য বলে গণ্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সব কাককেই ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করে থাকতে হয়। নইলে ময়ূরপুচ্ছধারীর দলে একঘরে হয়েই তাকে জীবন কাটাতে হবে।

অথচ এ-কথা মনে মনে কে অস্বীকার করবে যে, কবিতায় যদি প্রকৃত কাব্যরস থাকে তবে ছন্দ মিলে সে রসের উপভোগ বাড়ে বই কমে না। কবিতা পড়ে তার তাৎপর্য বুঝতে পারলে যে কবিতাটি বেশি ভালো লাগে একথাও অস্বীকার করা শক্ত। সেকেলে কবিতা — যেমন ধরুন, মেঘদূত, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি — যে আধুনিক সমালোচকদের দ্বারা বহুব্যাখ্যাত অনেক দুর্জ্ঞেয় সাম্প্রতিক কাব্যের চেয়ে ভালো লাগে একথাও মনে মনে মানতে হয়। আর শুধু কাব্যই বা কেন? মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম, চরনিয়োগ, শুল্ক, রাজার মিত্র, দণ্ডবিধি, রাজকর, যুদ্ধনীতি, রাজকোষ, দান, সদাচার, প্রভৃতি বিষয়ে যে সব উপদেশ দান করেছিলেন সেগুলি বর্তমান কালের 'অসাধারণ' নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মত, উক্তি ও কার্যকলাপের তুলনায় এতই আশ্চর্যরূপ যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় যে, বর্তমানের জগৎ-নায়কেরা এতটা অতিরিক্ত রকম মৌলিক না হলেই ভালো হোত বলে বিশ্বাস জন্মে।

কিন্তু আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরের দরকার কী? ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে কবিতার কথাই বলি। কয়েকদিন আগে একজন প্রগতিসম্পন্ন আধুনিক কবির মুখে শুনলাম যে তাঁর গুরুস্থানীয়, বাঙলার টি এস এলিয়ট বলে কথিত এক জন উচ্চস্তরের কবি নাকি বলেছেন যে, আমরা যে কবিতার মত করে কবিতা পড়ি, গদ্যের মত করে পড়ি না, এই কারণেই নাকি বাঙলা কাব্য এরূপ নিচু স্তরে রয়েছে — কোনো মতেই

ইংরেজী কবিতার মত সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারছে না। বলা বাহুল্য এ কথা শুনে খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম; কেননা আমার ধারণা ছিল যে, আমাদের কাব্যপাঠের এই গুরুতর ত্রুটি সত্ত্বেও বাঙলার কাব্য বেশ সমৃদ্ধ। অসাধারণ সাহিত্য-ব্যাখ্যানের আরো একটি উদাহরণ দিই। একজন বামপন্থী বিলেতফের্তা কাব্যরসিক (স্বয়ং কবি নন) কিছুদিন আগে বল্লেন যে, এ পর্যন্ত বাংলাতে যত কবিতা লেখা হয়েচে, সবেতেই বুর্জোয়া মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় বলে আমাদের সমস্ত কাব্যই নিরর্থক ও নিষ্ফল। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু' এ জাতীয় নিছক প্রেমের কবিতায় 'বুর্জোয়া'ত্বের চিহ্ন কী? তিনি বল্লেন তাঁকে একটু সময় দিলে তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারেন যে, এ সবই বুর্জোয়া কবিতা। সুখের বিষয় তখন আমার একেবারেই সময় ছিল না।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে করেই হোক কিছু সংখ্যক লোকের মনে একটা ধারণা জন্মেছে যে দুর্বোধ্য রচনা ও দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা দ্বারা উৎকর্ষ ও আভিজাত্য লাভ হয়। নিয়ত-অগ্রসর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ মানুষ পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না বলে যা সে বোঝে না তাকেই সে অত্যন্ত সমীহ করে। ভাবে যথোচিত শিক্ষিত হলে কথাটা তার নিশ্চয় বোঝা উচিত ছিল। লোকের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কিছু সংখ্যক চতুর ব্যক্তি নিজেদের কথায়-বার্তায় হাবে-ভাবে সাহিত্যে-শিল্পে এমন কতকগুলো দুর্বোধ্যতার ধোঁয়াটে জাল বুনে রাখে, যার মধ্য দিয়ে সাধারণ মন, সাধারণ শিক্ষা

সাধারণ উপলব্ধি কোনোক্রমেই প্রবেশ করতে পারে না। তখন ঐ ধোঁয়াটে জালের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে অধিকাংশ মানুষ ভাবে না জানি কী অপরূপ অভূতপূর্ব জিনিসই তৈরি হয়েছে। আর তখন, বুঝুক না বুঝুক, বাহবা দিয়ে তারা বলে, 'এমন জিনিস আর কখনো দেখিনি।'

অসাধারণ, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চেয়ে নিজেকে উঁচুদরের বলে ভাবা ও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা থেকেই উন্নাসিকতার সৃষ্টি। আর উন্নাসিকতার প্রধান অবলম্বনই হোল জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা, কেননা নিজেকে অপরের চেয়ে বিশিষ্ট উঁচুদরের কিছু একটা বলে প্রতিপন্ন করতে গেলে অপরের কাছে এমন একটা জিনিস এনে হাজির করা দরকার যাতে তাদের তাক লেগে যাবে। 'হ-য-ব-র-ল'র যে বেড়াল চন্দ্রবিন্দুর চ বেড়ালের তালব্য শ আর রুমালের মা দিয়ে চশমা বানিয়ে শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল, সেও নিশ্চিত এই উন্নাসিক দলেরই প্রতিনিধি।

এই মনোবৃত্তি থেকেই অনেক বিলেতফের্তা দিশ্শি সায়েব আমাদের মত নিরেট বাঙালীর কাছে আধা-সাহেবী অ্যাকসেন্ট-এ বিলিতি বুক্নি ঝাড়ে। উন্নাসিক ইংরেজেরা এই কারণেই কথার মধ্যে ফরাসী শব্দের খই ফোটায়. আমরা যেমন নিজেদেরকে শিক্ষিত প্রতিপন্ন করার চেষ্টাতে বলি — আমার ওয়াইফ, আমার ফাদার ইত্যাদি।

সাহিত্য-শিল্পেও নিজেকে অসাধারণ প্রতিপন্ন করার এই রকম কতকগুলি কৌশল আছে। কিম্ভুত কিম্বা উদ্ভট ধরণের আঙ্গিকে ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, মূর্তিগড়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যাঁরা এই

আঙ্গিকের প্রবর্তক, তাঁরা যে অক্ষম বা দুর্বল শিল্পী তা নয়। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে প্রতিভার উৎকেন্দ্রিক প্রেরণাই তাঁদের নতুন ভাবে ভাব-প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সেই সব অদ্ভুত আঙ্গিক যখনই ফ্যাশানে পরিণত হয় তখনই বুঝতে হবে যে, একদল উন্নাসিক লোক সেই নতুন ও দুর্বোধ্য সৃষ্টি-কৌশলকে অবলম্বন করে নিজেদের উঁচুদরের বোদ্ধা বলে জাহির করতে চাইছে। নইলে তথাকথিত 'সোসাইটি পিপল', বেশভূষা মদ্যপান পার্টি ক্লাব করেই যাদের সময় কাটে, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার মত যাদের বিন্দুমাত্র সময় নেই, তাঁদের ড্রয়িংরুম পার্টি ও ক্লাবে সর্বদাই দুর্বোধ্য শিল্প ও সাহিত্যের ভাসা ভাসা আলোচনাই ফ্যাসান হয়ে দাঁড়ায় কেন?

জগতে যে ক'জন অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পী নতুন ও কঠিনবোধ্য আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে অন্তরের গভীর ভাবকে সফল সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কিন্তু তাঁদের অনুকারীর সংখ্যা অগুনতি। প্রতিভার শক্তিতে যারা দুর্বল, সেই সব লেখক ও শিল্পীরা অনেক সময়ই নিজেদের রচনায় নানারূপ নতুনত্ব অহেতুকভাবে আমদানি করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে আসল নকল বোঝা সহজ নয়। দুর্বোধ্য আঙ্গিকের জাল ভেদ করে ভালো-মন্দ বাছাই করে নেবার ক্ষমতা, প্রবৃত্তি বা অবসর কোনোটাই তাদের নেই। এ কারণে নতুন কিছু দেখতে পেলেই চমৎকৃত হয়ে তারা তারিফ করে। লোকে এইরূপ করে বলেই দ্বিজেন্দ্রলাল সহজ খ্যাতির পন্থা হিসেবে

নতুন কিছু করার উপদেশ দিয়েছিলেন। বস্তুত সহজে নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার এরূপ কৌশল জগতে কমই আছে।

সাহিত্যের গুণাবলীর মধ্যে প্রসাদগুণ অন্যতম প্রধান গুণ বলে প্রাচীনকাল থেকে কীর্তিত আছে। সাহিত্যের লক্ষ্য যখন অপরের সহিত নিজের আবেগের সংযোগ, তখন অপরের পক্ষে দুরূহ ও অনধিগম্য সাহিত্য রচনা করতে গেলে তো সবই ব্যর্থ। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্যে যা পাঠকের অভিনিবেশ, চিন্তা ও উপলব্ধির একাগ্রতা দাবি করে, তা তার অন্তর্নিহিত ভাব। তার আস্বাদ গ্রহণের পুরস্কার হচ্ছে প্রচুর আনন্দ লাভ — যার স্বাদকে আমাদের ঋষিরা ব্রহ্মানন্দ স্বাদের সঙ্গে উপমিত করেছেন। কিন্তু শুধু শব্দার্থ উদ্ধার আর অন্বয় সাধনের চেষ্টায় এই অভিনিবেশ প্রয়োগ করে লাভ কী?

এই জন্য সাহিত্যের বহিরঙ্গের অকারণ দুর্বোধ্যতাকে তারিফ করবার কোনো মানে হয় না। প্রাঞ্জলতা যেমন গুণ, অস্পষ্টতা কিংবা দুর্বোধ্যতা তেমনি দোষই, তাকে বৈশিষ্ট্য বলে চালাবার চেষ্টা বৃথা। বলতে পারেন বড় বড় কবির লেখা দুর্বোধ্য কাব্য কি নেই? মহাভারতেও তো ব্যাসকূট আছে। এলিয়টও তো সুখবোধ্য নন। অনতিপ্রাঞ্জল উঁচুদরের কাব্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে মোটেই বিরল নয়।

কিন্তু এ সম্বন্ধে দুটো জিনিস অনুধাবন করতে অনুরোধ করি। প্রথমত বড় কবিদেরও দুর্বল মুহূর্ত আছে। ব্যাসকূটগুলকে কেউ মহাভারতের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে গণ্য করে না। দ্বিতীয়ত বড় বড় কবির উৎকৃষ্ট কাব্যে যে জটিলতা, তা প্রায়শই বুদ্ধি, অনুভূতি ও

ভাবের গভীরতার দরুণ, ভাষার মারপ্যাচের জন্য নয়। যেহেতু কবি-সাহিত্যিকেরা সাধারণ মানুষের চেয়ে গভীরতর অনুভূতি ও সূক্ষ্মতর চিন্তার অধিকারী, সেহেতু এটা খুবই স্বাভাবিক যে, তাঁদের সব ভাব ও চিন্তা পাঠক সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না, এজন্য তাকে খানিকটা অভিনিবেশ প্রয়োগ করে কবির ভাবধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হবে। কবি যখন নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে সব ভুলে গিয়ে তাঁর অন্তরের কথা বলতে থাকেন, তখন লোকে তাঁর চিন্তা ও ভাবধারার সঙ্গে সর্বদাই সহজে চলতে পারবে কিনা এ সম্বন্ধে সব সময় সচেতন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাঁর রচনার যেটুকু অস্পষ্টতা তা অন্তর্নিহিত অর্থ ও ভাবের গভীরতাজনিত, শব্দার্থ কিংবা বহিরঙ্গের চাতুর্যের দরুণ নয়।

কিন্তু উল্টো-পাল্টা করে কথা সাজিয়ে, জটিল, দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করে, বৈদেশিক পুরাণ ও ইতিহাসের চরিত্রের অহেতুক ও অযথা উল্লেখ করে, কঠিন সংস্কৃত ও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে যে-কবিরা উন্নাসিক ও অভিজাত কবি বলে পরিচিত হতে চেষ্টিত, তাঁরা তাঁদের চাতুর্যের পুরস্কার স্বরূপ অনেক লোকের বাহবা পাবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মহাকালের হাত থেকে কবি-সভার প্রবেশপত্র তাঁরা আদায় করতে পারবেন কিনা তা গভীর সন্দেহের বিষয়।

৭

আধুনিক গান

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মানুষের কানই হচ্ছে সবচেয়ে উদার ও নিরুপায় ইন্দ্রিয়। তার দরজা সর্বদাই খোলা ; কিছুই তাকে এড়িয়ে যায় না, কোনো আগন্তুককেই প্রবেশ-নিষেধ বলে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই। যা দেখতে ইচ্ছে করে না তার থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে, অথবা চোখ বুজেও থাকা যায়। যে স্বাদ ভালো লাগে না সে আস্বাদ গ্রহণ করবার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এমন কি ঘ্রাণকেও অনেকটা এড়ানো যায়। বিশেষত তার বিস্তার বেশি দূর নয় বলে রুচি-বহির্ভূত গন্ধ থেকে আত্মরক্ষা করার সমস্যাটা সাধারণ জীবনযাত্রায় খুব বড় নয়। কিন্তু কান! সংসারের যাবতীয় আওয়াজকে অভ্যর্থনা করবার জন্য সে সর্বদাই প্রস্তুত।. ট্রামের চাকার আওয়াজ, রাত্রি বারোটায় পানের দোকানের হল্লা, হোলির সময় পশ্চিমবাসীদের পক্ষকালব্যাপী এক সুরের গলা-ফাটানো সংগীত, পাশের বাড়ির বিয়ের সানাই ঢাক ও উলুধ্বনি, প্রতিবেশীর ঘরোয়া কলকোলাহল, সবই সমান ঔদার্যে গ্রহণ না করে কানের নিস্তার নেই। তার ঘরে দরজা নেই চোখের মত, আর দশ দিকই তার সমান ; যেদিকেই ফেরানো যায় সেদিক দিয়েই অপ্রার্থিত আগন্তুকেরা তার ভিতরে ঢুকবার জন্য বদ্ধপরিকর।

আত্মরক্ষায় অক্ষম আমাদের এই অসহায় ইন্দ্রিয়টির কথা যদি ভেবে দেখা যায়, তাহলে বিজ্ঞান যে মানব-জীবনকে ক্রমশই পরম সুখপ্রদ করে তুলছে একথায় সর্বান্তঃকরণে সায় দেওয়া মুশকিল। বিজ্ঞানের অবদান বলে কথিত জীবনযাত্রার ও আনন্দ উপভোগের যে সব উপকরণ আমরা ব্যবহার করি, তার অনেকগুলো সম্বন্ধেই আমার কিছু কিছু আপত্তি আছে। যেমন বিজলী-বাতির আলো প্রয়োজনানুযায়ী কমানো যায় না, মিটিমিটি অস্পষ্ট আলোয় বসে গল্প করা বা বিশ্রাম করার বিলাস বিজ্ঞান-শাসিত যুগে একেবারেই দুর্লভ হয়ে গেল, এটা আমার ভাল লাগে না। এ-ও তবু সহ্য হয়। কিন্তু বেচারী কানকে বিপর্যস্ত করবার জন্য বিজ্ঞান যে সমস্ত চমকপ্রদ উপকরণ আমাদের উপহার দিয়েছে, তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে চলবার কোনোই উপায় নেই। শব্দের শক্তিশেলে নিয়ত বিদ্ধ আমাদের মন ও রুচিকে বাঁচিয়ে রাখা আজকালকার দিনে যে এক গুরুতর সমস্যা, আশা করি অনেকেই এ কথা মানবেন। কেউ কেউ বলতে পারেন, আপনি মশাই যদি এমনি ভারিক্কে মেজাজের লোক হয়ে থাকেন যে, গ্রামোফন রেকর্ডে দুখানা গান কিম্বা রেডিওতে নাটক আর সঙ্গীতশিক্ষার আসর কানে গেলেই আপনার জাত যায়, তাহলে দরকার কী ওসব শুনে? গ্রামোফোন নাই কিনলেন, রেডিও রাখবার জন্যেও আপনাকে কেউ মাথার দিব্য দিচ্ছে না, আর যদি আপনার বাড়িতে রেডিও-গ্রামোফোন থেকেও থাকে, তবু তা চালানো না চালানো তো আপনারই ইচ্ছাধীন।

এইরূপ কথা শুনে মনে হতে পারে আজকালকার সমাজে প্রকৃতই বুঝি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে কোনো জিনিস আছে। যে বাড়িতে একাধিক ব্যক্তি বাস করে, সেখানে নিজের ইচ্ছে ও রুচি অনুযায়ী কোনো কিছু চালানো যদি বা সম্ভব হয়, বন্ধ করা যে একেবারেই অসম্ভব একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা ও অতিথি-অভ্যাগতের রুচিবৈচিত্র্যের কল্যাণে, সাধারণ পরিবারে ভোরবেলার কুস্তি শিক্ষা থেকে রেডিও-প্রচারিত যাবতীয় জিনিস শোনবার লোকাভাব হবে, এরূপ কল্পনা করা নিদারুণ মূঢ়তা ছাড়া আর কী? গ্রামোফোন বা টেলিফোন বাড়িতে থাকলে সেগুলি যে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজে লাগানো যায় সেটা খুবই সুবিধের। কিন্তু অনিচ্ছুক কানকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার যে কোনো উপায়ই নেই সেটাও কম অসুবিধের নয়। আর যদিও বা নিজের ঘরকে ঐ সকল বিলাসের উপকরণ থেকে মুক্ত রাখা যায়, পাশের বাড়ি, রাস্তার দোকান ও নিকটবর্তী সিনেমা হাউস প্রভৃতিকে এড়াবার কি কোনো উপায় আছে? অভিমন্যুর মত বিজ্ঞান মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় এমন কি মনের ভিতর ঢুকে আক্রমণ চালাবার কৌশল পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পেরেছে, শেখেনি শুধু বেরিয়ে আসবার কৌশল। তাই মনের রাজ্যটি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টায় এই অদ্ভুতকর্মা বীর বিজ্ঞানের সঙ্গে নিত্যই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কোথায়?

কথাটা হচ্ছে এই যে, বাড়িতে একটি রেডিও থাকার ফলে সময়ে অসময়ে আধুনিক গান শুনে শুনে আমি হদ্দ হয়ে গেছি। আমি যে খুব বেশি সেকেলে লোক তা নয়। আধুনিকতার বিরুদ্ধে কোনোরূপ

বিদ্বেষও পোষণ করি না, তার নিন্দাবাদ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ললিতকলাকে অধিকাংশ লোকের পছন্দ অনুযায়ী করে গড়তে গেলে তার ফল যে কিরূপ মারাত্মক হয়, সেটা হৃদয়ঙ্গম করে ক্রমশই কাহিল হয়ে পড়ছি।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ভক্তিরসাশ্রিত গান, বাউল বা ভাটিয়ালী গান এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত যে অনাধুনিক একথা নিশ্চয় কেউই বলবেন না। কিন্তু এসব জাতীয় গানের শ্রোতাসংখ্যা বড়ই সীমাবদ্ধ। মনের গঠন ও মানসিক শিক্ষার প্রকৃতি অনুযায়ী একেকজন একেক জাতীয় গান পছন্দ করেন। কিন্তু মন বলে বস্তুটিই যাদের উহ্য, মানসিক শিক্ষা যারা সিনেমা দেখে অথবা পত্র-পত্রিকায় প্রশ্ন পাঠিয়ে সংগ্রহ করে, সেই অধিকাংশ লোককে খুশি করবার জন্যে যে গান তৈরি হয়, সে বস্তু রুচিবান্ মনের বিভীষিকা ছাড়া আর কী ?

কণ্ঠসঙ্গীত মাত্রেরই দুটো দিক আছে। একটা তার সুর, অপরটি পদ। কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে সুর সৃষ্টি হয়, তাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। পদ ও সুর মিলে মানুষের অন্তর্নিহিত ভাব ও অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করে। সুর সম্বন্ধে অবশ্য আমি বিশেষজ্ঞ নই। তবু একথা বলতে পারি যে, গলার মধ্য দিয়ে বেশ একটা ন্যাকা-ন্যাকা বিগলিত ভাব বার করাই আধুনিক গানের একটি প্রধান চিহ্ন। আর পদ! গায়কেরা সর্বদাই প্রেমে বিগলিত হয়ে কাঁদুনির সুরে ভালোবাসার কথা বলুন, তাতে আমার আপত্তি তত গুরুতর নয়। কিন্তু অর্থসঙ্গতি, উপমার সম্ভাব্যতা, বক্তব্যের পারম্পর্য প্রভৃতি রক্ষা করে গানের পদ বাঁধতে কী দোষ আছে ?

যেহেতু অধিকাংশ লোক কবিতার বা গানের কথার অর্থ বোঝে না, সেহেতু অধিকাংশ লোককে পরিবেশন করবার জন্য গান তৈরি করলে তাতে অর্থসঙ্গতি রাখবার দরকার হয় না, এই হচ্ছে গানের কারবারীদের প্রচলিত মনোভাব। কথাটা অবশ্য নেহাৎ মিথ্যেও নয়। এই যে অর্থহীন আর্তনাদ, কচি-সংসদের কণ্ঠে যা শুনে নাকি জান্তব সঙ্গীত বলে মনে হয়েছিল, তার চাহিদা কী অসাধারণ! রেডিওতে, জলসায়, বিবাহযোগ্য কন্যার কণ্ঠে, পূজোর আনুষঙ্গিক সঙ্গীত হিসেবে আধুনিক গানের জোগাড় না রেখে উপায় নেই। এ গানকে বাদ দিলে রেডিও — যা হচ্ছে জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান — অসংখ্য পত্রাঘাতে জর্জরিত হয়ে জবাবদিহি করতে করতে প্রাণান্ত হবে, বিবাহযোগ্যার বিয়ে হবে না এবং পূজো বাড়িতে ঠাকুর দেখতে এসে লোকে আধুনিকগানহীন পূজোয় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ফিরে যাবে। এক্ষেত্রে আধুনিক গানের সাম্রাজ্য যে ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে চলেছে এ আর আশ্চর্য কী? সাহিত্যের যেটা জনপ্রিয় অংশ সেটাকে যথাসম্ভব দূরে রেখে চলা সম্ভব। কিন্তু কানের দুর্বলতার দরুণ জনপ্রিয় সঙ্গীতের আক্রমণ থেকে বাঁচবার কোনো উপায়ই আর দেখতে পাচ্ছি না।

যার থেকে শেখা যায় যে, ললিতকলাকে মেজরিটির রুচি অনুযায়ী গড়তে গেলে শিব গড়তে বাঁদর না গড়ে আর উপায় নেই। আর যদিও পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বাঁদর নাচ দেখতেই ভালোবাসে, তবু মুষ্টিমেয়ের জন্য এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে তারা ঐ বীভৎসতা থেকে নিজেদের ইন্দ্রিয়, রুচি ও মনকে মুক্ত রাখতে

পারে। মানুষের মনকেও যে সর্বদা গণভোট মেনে চলতেই হবে, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া আমার কাছে একটু বাড়াবাড়িই মনে হয়।

তা ছাড়া বর্তমান কালে প্রচলিত সব কিছুকেই আধুনিক নামে আখ্যাত করা চলে না। প্রমাণ, আজকাল মেয়েরা যে ধরণের শাড়ি ও অলঙ্কার পছন্দ করেন তা অধুনা প্রচলিত হলেও ঠিক আধুনিক নয়, আমাদের ঠাকুমাদের সময়ে ও-ধরণের বেশভূষা প্রচলিত ও সমাদৃত ছিল। পুরুষের বেশেও গতকাল যা আধুনিকতার চরম ছিল, রাষ্ট্রের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আজ তা পূর্বতর মোগলাই আধুনিকতাকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। সর্বদাই এরূপ ঘটে আসছে। গতকালের আধুনিক আজ সেকেলে আবার আগামীকাল যে আধুনিক হয় চুল ছাঁটাইয়ের বিবর্তনেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষণ হিসেবেও আধুনিক কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। আধুনিকতার ধারণা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ব্যক্তিতে, বিভিন্ন কালে পৃথক বলে কোনো কিছুকে আধুনিক বলে বর্ণনা করলে স্পষ্ট করে কিছুই বোঝা যায় না। যদি বলা যায়, কোনো একটি লোক আধুনিকতাসম্পন্ন, তাহলে কেউ বুঝবেন ক্লাব ও মদ্যপানে উৎসাহী লোককে, কেউ বুঝবেন সাদাসিধে সংযত চরিত্র বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে, কলেজের ছেলেমেয়েরা হয়তো বুঝবে সিনেমা-নিমজ্জিত সিনেমা-অনুকারী-ভঙ্গিমা-সম্পন্ন যুবককে এবং স্ত্রীরা হয়তো বুঝবেন এমন লোকদের যারা আমার মত কুনো ও অলস নয়, যারা সন্ধ্যাকালে চমকপ্রদ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে সস্ত্রীক মার্কেট-রেস্তোরাঁ-সিনেমা-থিয়েটারে ঘুরে বেড়ায়। বস্তুত সংজ্ঞা হিসেবে

আধুনিক কথাটির কোনোই মানে হয় না। আজকের আধুনিক-আধুনিকা যে কালকের নবীন-নবীনাদের থেকে বড় বেশি দূরে সরে এসেছে এমন প্রমাণ নেই। বরং রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন যে এখনকার তরুণী —

পরেন বটে জুতো মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্য দেশীর চালে,
তবু দেখ সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।

সেটাই সত্য বলে মনে হয়। তাই যখনই শুনি আধুনিক গান, তখনই বুঝি যে এমন এক জাতীয় সঙ্গীতের উল্লেখ করা হচ্ছে কোনো সংজ্ঞাতেই যাকে বোঝানো যায় না, বস্তুত যা নামগোত্রহীন।

আসলে সাহিত্য বা সঙ্গীত সম্বন্ধে 'আধুনিক' শব্দটির প্রয়োগ একেবারেই অর্থহীন। অবশ্য চিরকালই সাহিত্যিক গায়ক ও শিল্পীরা নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে নিজেকে প্রকাশ করতে চান। তার মধ্যে কিছু উৎরোয়, কিছু উৎরোয় না। যেটুকু বেঁচে থাকে সেটুকু নতুন ধরণের বলে থাকে না, ভালো বলেই থাকে। চারুকলার ইতিহাসে এমন কোনো সময়ই ছিল না যখন যাবতীয় শিল্পী একই ধরণের নতুনত্বের দিকে ঝুঁকেছেন অথবা সবাই মিলে সর্বপ্রকার প্রাচীন ও

প্রচলিত রীতিকে বর্জন করে চলেছেন। এরূপ শিল্পীও খুব কম পাওয়া যাবে যাঁরা সর্বদাই প্রচলিত আঙ্গিক ও প্রকাশ-পদ্ধতিকে এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন।

কাজেই আধুনিক সাহিত্য, আধুনিক গান, আধুনিক চিত্রকলা কথাগুলির দ্বারা কোনো বিশেষ ধরণের সাহিত্য গান কিম্বা ছবি আঁকার পদ্ধতিকে নির্দিষ্ট করার কোনো মানে হয় না। যামিনী রায়ের ছবি যেরূপ আধুনিক, সেরূপ প্রাচীনও বটে, কেন না এই প্রখ্যাত শিল্পীর চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি কোনো এক বিগত সময়ে প্রচলিত পদ্ধতিকে ভিত্তি করে পরিকল্পিত। তা ছাড়া যামিনী রায় যেরূপ আধুনিক, অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালও সেরূপ আধুনিক, কেন না আধুনিক মনের কাছে এঁদের কারুর ছবির সৌন্দর্যই বিন্দুমাত্র ম্লান নয়। আধুনিক কালের সব মানুষের মন ও রুচি গড্ডলিকার মত একই পথে চলেছে বা সেইরূপ চলা সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় একথা রাজনীতিক মোহে আছন্ন মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া কেউই মনে করে না। সে কারণে আধুনিক সাহিত্য কথাটির দ্বারা যদি কেবল কোনো বিশেষ ধরণের, বিশেষ ভঙ্গির, বিশেষ মতামত-সম্বলিত লেখাই বোঝানো যায়, তাহলে অন্য ধরণের লেখার রচয়িতা ও অন্য জাতীয় লেখার অনুরাগীদের প্রতি গুরুতর অবিচার করা হবে। সেইরূপ, আধুনিক গান বলে যদি এমন কিছু বোঝাবার চেষ্টা করা হয় যার মধ্যে আমাদের প্রাচীন ভক্তিমূলক ও পল্লীগীতি সম্পদ অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের গান সে আধুনিকতার বহির্ভূত, তবে সেটা কী জাতীয় অধ্যানিক বলে বুঝবো ?

আর আমরা বহু সংখ্যক আধুনিক মানব ও মানবী কেনই বা তার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হতে বাধ্য হব ?

আমার বিশ্বাস, চিরকালই এমন অনেক লোক ছিল, যারা অর্থ-সঙ্গতিহীন মিঠি মিঠি কথা সাজিয়ে গান বাঁধতো। এমন অনেক লোকও নিশ্চয়ই ছিল যারা ন্যাকা-ন্যাকা সুরে গান গাইতো। এরূপ অসংখ্য লোকের সর্বকালীন অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করি না যারা ঐ জাতীয় গানের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু তা যে আজ সবই হারিয়ে গেছে এতেই প্রমাণ হয় যে, তার আবেদন স্বল্পসংখ্যক লোকের কাছে সাময়িক ভাবেই মাত্র ছিল, বুদ্বুদের মত জন্মেই তা আবার মিলিয়ে গেছে।

লোকে শুনতে চায়, অতএব পূজো বাড়ীতে, বিয়ের আসরে ও রেডিওতে আধুনিক গান বহুলভাবে প্রচারিত করতে হবে — এই যুক্তিতে বলা যায় যে, রেডিওর 'সাহিত্য-বাসরে'ও বটতলীয় সাহিত্যই পরিবেশিত হওয়া উচিত। কেননা, সাহিত্যের যেটা নিকৃষ্ট কিন্তু সহজবোধ্য অংশ সেটাই যে অধিকাংশ লোকের প্রিয় এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একথা সকলেরই জানা উচিত এবং রাষ্ট্র-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের বিশেষভাবে মনে রাখা কর্তব্য যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের পছন্দ দিয়ে চারুকলার মান নির্ণয় করা যায় না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য মুষ্টিমেয় লোকেরই মাত্র উপলব্ধিগোচর, অধিকাংশ লোকই তার উপভোগ থেকে বঞ্চিত। একথাও মনে রাখা উচিত যে, রাষ্ট্রের কর্তব্য নয়, অধিকাংশের মানে নিজেকে নামিয়ে আনা। জনসাধারণের মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবেশন

দ্বারা তাদের রুচি ও পছন্দকে উন্নত করাই বরং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। কাজেই বাড়িতে থেকে, রাস্তা চলতে, কারু বাড়ি বেড়াতে গিয়ে, সর্বদাই আমাদের আধুনিক গানের আঘাতে ঘায়েল হতে হবে, এ বড়ই অবিচার।

আর এ কথাও বলি মশাই, সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী, সুকণ্ঠ, সুরবিস্তারে দক্ষ সব গায়ক-গায়িকাই যে কেন ঐ অতি সহজ ও একঘেয়ে 'আধুনিক' গানের দিকে ঝুঁকেছেন, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। এতে না আছে সুরবিস্তারের কোনো সুযোগ, না আছে অন্য কোনোভাবে সাঙ্গীতিক দক্ষতা দেখাবার উপায়। তবু ঐ যে এক যুক্তি লোকে শুনতে চায়, ঐ যে এক মোহ জনপ্রিয়তা, তাতেই আমাদের কানের দফা সেরেছে। কোন বিখ্যাত গায়ক যে কবে জনপ্রিয়তার মোহে 'আধুনিক সাঙ্গীতিক' হয়ে পথ দেখিয়েছিলেন জানি না। তারপর থেকে — জানেনই তো —

ঐসী গতি সন্‌সারমে যো গাড়র কি ঠাট।
এক পড়া যব গাঢ়মে সবৈ যাত তেহিং বাট॥

৮

নাট্য ও নৃত্য

ভারতচন্দ্র বলেছেন, 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।' আমাদের প্রচলিত রীতি ও লৌকিক সংস্কারের মেষশৃঙ্গ কয়েকটি উঁচুদরের ললিতকলাকে এরূপ সাঙ্ঘাতিক আঘাত করেছে যে, সেগুলির পক্ষে এখন নিজস্ব প্রাপ্য মর্যাদা ফিরে পাওয়া খুবই শক্ত। অথচ যতদিন না এরা সর্বপ্রকার সংস্কারগত অবহেলা ও তাচ্ছিল্য থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাচ্ছে, ততদিন কিছুতেই খুব বেশি উৎকর্ষ লাভ করতে পারা এদের পক্ষে সম্ভব হবে বলেও মনে হয় না।

যতদিন ধরে নটী ও বারাঙ্গনা সমার্থক হয়ে নটীরা সমাজে অপাংক্তেয় ও সমাজ-জীবন থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়েছে এবং যতদিন ধরে প্রকাশ্যভাবে জনরঞ্জনের জন্য নৃত্য ও অভিনয়ের চর্চা পণ্যা স্ত্রী ও তৎসংশ্লিষ্ট পুরুষদের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ থাকতে দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, ততদিনে আমরা প্রায় ভুলে গেছি যে, এগুলি কেবলমাত্র ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ কিংবা বিলাসাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির উপকরণ নয়, এগুলি হচ্ছে সাধনযোগ্য অতি উচ্চস্তরের ললিতকলা। অধুনা সঙ্গীত অনেকাংশে ও নৃত্য কিয়ৎপরিমাণে আমাদের সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে বটে, কিন্তু নাটকের কথা ধরুন। সে এখনও জাতিচ্যুত।

সেই জন্য বাঙলাতে উঁচুদরের নাটক লেখা হচ্ছে না বলে আক্ষেপ

করে লাভ নেই। আর মস্কো আর্ট থিয়েটারের নাম করে অশ্রু-বিসর্জনও বৃথা। থিয়েটার আজও আমাদের দেশে কিছু নীচ, কিছু হীন, যেন একটু অশুচিও। তাই অসামান্য প্রতিভা, উন্নত শিক্ষা, অসীম উচ্চাশাও এই ক্ষেত্রে এলে পায় শুধু লোকের অনুকম্পা-মিশ্রিত প্রশংসা — কিন্তু পায় না শ্রদ্ধা, পায় না পূজা। আমাদের দেশে থিয়েটার সম্বন্ধে বিদগ্ধ সমাজে কোনো আগ্রহ বা কৌতূহল নেই, রঙ্গভূমি রসিকসমাজের মিলনক্ষেত্র নয়। বাঙলাদেশের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের একাংশ এখনও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে থিয়েটার দেখতে যাওয়াকে চারিত্রিক হীনতার লক্ষণ বলে মনে করে; এবং যারা বারাঙ্গনাদের সঙ্গে অভিনয় করতে নামে, তারা যতই ভালো অভিনয় করুক, নিজস্ব সামাজিক স্তর থেকে তারা অনেক ধাপ নিচে নেমে যায়। লোকটা থিয়েটার করে শুনলেই সবাই বুঝে নেয় সে কত নিচুস্তরের মানুষ। সু-অভিনয়ের জন্য পিঠ-চাপড়ানো করতালি ছাড়া সে আর কিছু আশা করতে পারে না। এবং বলা বাহুল্য, পায়ও না। আর, একথাও সত্য যে থিয়েটারের নট-নটীরা সহজ ও স্বাভাবিক সামাজিক জীবন থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত বলে, তাদের জীবনযাত্রাও প্রায়শই এরূপ অস্বাভাবিক রূপ নেয় যে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মানবজীবনকে রূপায়িত করবার সাধনা থেকে তারা অনেক সময়ই ভ্রষ্ট হয়ে যায়। গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আমাদের নাটক হীনতার চক্রে ঘুরছে। যেহেতু আমাদের সংস্কারে ও ধারণায় থিয়েটার অতি নিচু জিনিস সেকারণে স্বাভাবিক সমাজীবনে বঞ্চিত নর-নারীরাই এখানে আশ্রয় নেয়। আবার যেহেতু

সমাজে অপাংক্তেয় কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এর মধ্যে থাকে, তাই অন্য যারা জীবিকার তাগিদে বা প্রতিভার প্রেরণায় এখানে এসে জোটে তাদেরও ভদ্রসমাজ থেকে বিচ্যুত হওয়া ছাড়া আর গতি থাকে না!

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এইরূপ একটা হীনতার ধারণা জড়িত আছে বলেই আমাদের দেশে ভালো নাটক রচিত হওয়া শক্ত। এবং যতদিন আমাদের সমাজে এরূপ মনোভাব প্রচলিত থাকবে ততদিন উৎকৃষ্ট নাটক — যা একাধারে উত্তম সাহিত্য এবং মঞ্চেও সার্থক — লেখা হবার আশাও কম। আমাদের সাহিত্যিকরা বাল্যকাল থেকে বড় কবি, বড় উপন্যাসিক, বড় গাল্পিক হবার উচ্চাশা পোষণ করেন বটে, কিন্তু বড় নাট্যকার হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোনো সাহিত্যিকের মধ্যেই প্রধানত বলবৎ হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটক উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয়েও মঞ্চে সার্থক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, যার আলোচনা পরে করা যাবে। এ-ছাড়াও ভালো বাংলা নাটকের দৃষ্টান্ত আছে, যা ভালো সাহিত্যও বটে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। আমাদের সাহিত্যিকরা সবই হতে চান, হতে চান না শুধু বড় নাট্যকার। এমন কি আমাদের দেশে যাঁরা শুধুই নাট্যকার, অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চের জন্য নাট্যরচনাই যাঁদের লেখক হিসেবে একমাত্র পরিচয়, তাঁরা সাহিত্যিক সমাজে সমাদৃত নন। বস্তুত, অন্য সাহিত্যিকেরা এঁদেরকে সাহিত্যিক বলেই গণনা করেন না। এঁদের খাতির একমাত্র রঙ্গমঞ্চ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে, এবং খানিকটা প্রকাশকদের কাছে। এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতও নয়;

কেননা সাহিত্যিকেরা জানেন যে শুধুই নাট্য-সাহিত্যের চর্চা জাত না খুইয়ে করা সম্ভব নয়।

জগতে যাঁরা নাট্য-সাহিত্যিক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদেরকে প্রায় সর্বদাই থিয়েটার জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে হয়েছে, কেননা এরূপ না করলে রঙ্গমঞ্চের জন্য সার্থক নাটক রচনা করা অসম্ভব। অনেকের ধারণা আছে যে নাটক যখন প্রধানত বাক্যালাপের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্ত, তখন যে কোনো ভালো সাহিত্যিকই — আলাপ রচনার যাঁর দক্ষতা আছে, তিনিই — নাটক লিখতে পারেন। কিন্তু নাট্যরসিক মাত্রই জানে এ-ধারণা কত ভ্রান্ত। যে আলাপ পাঠে উপভোগ করা যায়, সে আলাপ অভিনয়ে উপভোগ্য না হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। যাঁরা ভালো নাট্যকার হতে চান তাঁদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য রঙ্গমঞ্চের পরিবেশে কিছুদিন, অন্তত নাট্যরচনার সময়টাতে, নিজেকে ডুবিয়ে রাখা। রঙ্গমঞ্চে কী ধরণের কথা কী ভাবে উক্ত হলে মর্মস্পর্শী হয়, কীরূপ কথাবার্তা কী ভাবে উচ্চারিত হলে ভালো শোনায়, কোন্ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর উচ্চারণ কেমন, কী ধরণের চরিত্র কীরূপ অভিনয়ে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে পরিস্ফুট হতে পারে, সবই নাট্যকারের খুব ভালোভাবে জানা ও বোঝা দরকার। এ কারণে নাটক রচনার সময় অভিনয়কলার প্রতি সূক্ষ্ম অভিনিবেশ প্রয়োগ এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা একান্ত প্রয়োজন। তারপর নাটক রচনা হয়ে গেলে পরও এ বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রযোজকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে অনেক সময় রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনানুযায়ী তাকে

কাট-ছাঁট, অদল-বদল করতে হয়। অভিনয়ের মহড়াতেও নাট্যকারের উপস্থিতি প্রয়োজন, কেননা কোন্ জায়গাগুলো নাটকে ঠিক জমছে না তা ভালোভাবে বুঝে অনেক রকম পরিবর্তন আবশ্যক হতে পারে। এ কারণে সর্বদেশেই বড় বড় নাট্যকারদের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হতে হয়, নিয়মিত নাটক দেখতে যেতে হয়, নাট্যসমালোচনা পাঠ করতে হয় এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী ও প্রযোজক-পরিচালকদের সঙ্গে মিশে তাদের মতামত ক্ষমতা ও মেজাজ অনুধাবন করতে হয়। এইরূপে নাট্যশিল্পের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব কিছু জেনে ও বুঝে তবেই উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক উঁচুদরের নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন।

অন্যান্য দেশে নাট্যকার-যশঃপ্রার্থী নবীন সাহিত্যিকের পক্ষে এইরূপ ভাবে নাট্য-শিল্পের পাঠ নেওয়া সম্ভব। কেন না, সে-সব দেশে নাট্যজগতের ব্যক্তিরা স্বাভাবিক সামাজিক জীব। কারুর থেকেই তারা নিচু নয়, হীন নয় তারা কোনো অংশে, কোনো সামাজিক মাপকাঠিতে। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলে কেউ নিন্দিত হয় না। বরঞ্চ বিদগ্ধ সমাজ সর্বদেশেই কৃতী অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গলিপ্সু। কিন্তু আমাদের দেশে এরা নিন্দিত ও জাতিচ্যুত। শিক্ষিত সমাজের অনেকেই 'জীবনে থিয়েটার দেখিনি' বলতে গৌরব বোধ করেন। এক্ষেত্রে প্রতিভাবান সাহিত্যিক জাত বজায় রাখবার দায়ে প্রথম থেকেই থিয়েটারের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবেন এতে আশ্চর্য কিছুই নেই।

শুধু নাটকই বা বলি কেন? নৃত্য সম্বন্ধেও খুব একটা সামাজিক শ্রদ্ধা এতকাল আমরা পোষণ করেছি বলে মনে হয় না। এমন কি

এককালে বহুর মনোরঞ্জনের জন্য সঙ্গীত পরিবেশনে ভদ্রসমাজ যেন কুণ্ঠিতই হোত। আসরে ও জলসায় মেয়েদের গান গাওয়া অধুনা প্রচলিত হলেও আমাদের ছোটবেলায় এরূপ রেওয়াজ ছিল না। ক্বচিৎ কখনও ব্যতিক্রম হয়ে থাকলে সেটা দুঃসাহসিক কাজ বলেই গণ্য হোত। গান গেয়ে পয়সা উপার্জন করা মেয়েদের তো কথাই নেই, ভদ্র পুরুষের পক্ষেও খুব সম্মানজনক ছিল না। সেকালে সম্ভ্রান্ত সমাজের যে কজন ব্যক্তি গ্রামোফোন রেকর্ডে গান দিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই গেয়েছেন অনুগ্রহ করে, এর চিহ্ন স্বরূপ এঁদের নামের পিছনে 'অ্যামেচার' বলে বিজ্ঞপ্তি থাকতো। আর নাচ! এক লোকনৃত্য আর বাইজীর নাচ ছাড়া অন্য কোনো নৃত্যের অস্তিত্বই এককালে টের পাওয়া শক্ত ছিল। অবশ্য যাত্রা থিয়েটারে সখীদের নৃত্য প্রচলিত ছিল, কিন্তু তার মধ্যে ললিতকলা পরিবেশনের কোনরূপ প্রচেষ্টা আছে, পরিবেশকেরাও কখনো এরূপ দাবি করেন নি। তবুও কী আশ্চর্য, কয়েকজন ইদানীন্তন নৃত্য-সাধকের অসীম দুঃসাহসিক ও ধৈর্যময় সাধনায় আমরা আজ বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের নৃত্যের ঐতিহ্যকে অগ্নিহোত্রীর মত কয়েকজন সাধক বহন করে নিয়ে এসেছিলেন বলেই রক্ষে। তাই আজ আমরা আমাদের নৃত্যশিল্পীদের নাম করে গর্ব অনুভব করতে পারি। এমন কি এই বিশেষ ললিতকলার চর্চায় ভারত যে অতি অগ্রসর এ কথাও জগতে প্রচারিত করতে কুণ্ঠিত হই না।

তবুও ভেবে দেখতে গেলে, চারুকলা হিসেবে নৃত্য আমাদের শিক্ষিত ও বিদগ্ধ সমাজে এখনো ঠিক ততটা সমাদর লাভ করেনি যতটা তার প্রাপ্য।. নাচিয়ে যুবক যুবতীদের সম্বন্ধে এখনো আমাদের

কোথায় যেন একটু খুঁতখুঁতি আছে। বড় বড় স্টেজে নামজাদা নাচিয়েদের নাচ দেখতে যাওয়া যে পরিমাণে অর্থবান্ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের একটা বিলাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সে পরিমাণে যেন সে বিদগ্ধ জনের কৌতূহল উদ্রেক করেনি। আর নাচিয়েদেরকে আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ ঠিক নিজের সমাজের লোক বলে মেনে নিয়েছে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

তার প্রমাণ দেখুন, বিয়ের ব্যাপারে আমরা সকলেই কনে পছন্দ করার সময় মেয়েকে দিয়ে হারমোনিয়াম সহযোগে গান গাওয়াই বটে কিন্তু বিয়ের পরও আসরে জলসায় স্ত্রীকে অবাধে সঙ্গীত পরিবেশনের অধিকার দিতে খুব কম স্বামীই প্রস্তুত। আর নাচের কথা তো বলাই বাহুল্য। 'যখন ছেলেমানুষ ছিলে তখন নেচেছো, এখন বিয়ে করে ঘরকন্না করো', এইটেই ভদ্রসমাজে শিক্ষিত পুরুষদের সাধারণ মনোভাব। এর ব্যতিক্রম কম। অথচ নৃত্যকে যদি আমরা চারুকলা বলে মানি তাহলে এতে পরিপূর্ণ সাফল্য দীর্ঘ সাধনা ভিন্ন হতে পারে না এটাও মানা উচিত। যে মেয়ে বাল্যকাল থেকে শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে নৃত্যশিল্পের চর্চা দ্বারা বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে, হঠাৎ তার সাধনা ভঙ্গ করে দিলে এই শিল্পের চর্চা ব্যাপ্তি লাভ করাই শক্ত। বিয়ের পরের কথাই বা বলি কেন, মুখে যতই শিক্ষা ও বৈদগ্ধ্যের বড়াই করি, নাচিয়ে গাইয়ে মেয়েকে বিয়ে করতে আমাদের সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিরই বেশ আপত্তি আছে। তার চেয়ে মোটামুটি লেখাপড়া আর ঘরকন্না জানা মেয়ে হলেই আমরা বেশি খুশি। কেননা মনের কোণে কোথায় যেন একটুখানি বিশ্বাস অনেকেরই আজও

রয়েছে যে যারা জনসমক্ষে নাচে গায়, তারা ঠিক আমাদের সমাজের লোক নয়, তাদের সমাজ আলাদা।

রবীন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ তিনি ললিতকলার এই সব অবহেলিত ও সমাজবর্জিত শিল্পকে নিজের একক চেষ্টায় সমাজের সাধারণ স্তরে অনেকখানি ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। অন্তত সাধারণ সমাজে নাচা গাওয়া অভিনয় করার যে সংকোচ ও লজ্জা, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় যে তার অনেকখানিই ঘুচে গেছে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না। সহজে, লজ্জায় জড়সড় না হয়ে, প্রাণের স্ফূর্তিতে গান গাওয়ার দুঃসাহসিকতা বাঙলা দেশের ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই অর্জন করেছে। বৃক্ষরোপণ থেকে শুরু করে নানা মাঙ্গলিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে মেয়েদের প্রকাশ্যভাবে নাচার প্রবর্তন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাতেই। নইলে ভদ্রমেয়ে সর্বসমক্ষে নাচবে একথা আগেকার দিনে কে ভাবতে পারতো! তারপর অভিনয়। সর্বদেশে যেরূপ হয়ে থাকে এবং আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে যেরূপ হোত, সেইরূপ অনধঃপতিত পুরুষ ও মেয়ে মিলে নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান যে সম্ভব এরূপ কল্পনা করতেও এককালে আমাদের ভদ্রসমাজ শিউরে উঠতো। এ সম্বন্ধে আমার ছোটবেলার একটা গল্প মনে পড়ছে। বছর তিরিশ আগেকার কথা। ঢাকা শহরে শখের দলের নাট্যাভিনয় হচ্ছে। শখের দল হলেও এই দলের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন নামজাদা অভিনেতা। কেবল নামজাদা অভিনেতা নন, উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। যে ভদ্রলোক পিয়ারা সেজেছেন তিনি খর্বকায় ও সুদর্শন, তাঁর কণ্ঠস্বর মিহি, তদুপরি তিনি সঙ্গীত

পারদর্শী। মেয়ের পার্ট করে করে নারীজনোচিত হাবভাব প্রকাশেও তাঁর বেশ দক্ষতা জন্মেছিল। কয়েকটা দৃশ্য অভিনয় হয়েছে এবং নাটক বেশ জমেছে। এমন সময় রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে হৈ হৈ ব্যাপার। বিষম কোলাহল। জানা গেল কয়েকজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উচ্চকণ্ঠে তীব্র ভাষায় আপত্তি জানাতে নেপথ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। 'কী মশাই, আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে মেয়ে নিয়ে অভিনয় করছেন। ছি ছি ছি। অ্যামেচার থিয়েটারে মেয়ে থাকবে না ভরসা করে আমরা পরিবার নিয়ে থিয়েটার দেখতে এসেছি। হায় হায়, আমাদের মাথা কাটা গেল' ইত্যাদি বিলাপে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠলো। পিয়ারা যে প্রকৃতই পুরুষ, মেয়ে নয়, এ বিষয়ে ভদ্রলোকের বিশ্বাস জন্মিয়ে তবে সেদিন আবার নাটক চালানো সম্ভব হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও নাচ-গান ও অভিনয়কে আমাদের সমাজ-জীবনে সহজ ও সংস্কারমুক্ত করার চেষ্টা কম দুঃসাহসিক ছিল না। এবং তিনিও এর দরুণ কম নিন্দিত হননি। অধ্যাপক প্রমুখ বহু শিক্ষিত লোক ছেলেমেয়েকে শান্তি-নিকেতনে পাঠাতে চাননি, কারণ সেখানে 'ছেলেমেয়েগুলো নাচতে গাইতে শেখে'। ইদানীং আমরা — শিক্ষিত বাঙালী — নিজেদেরকে সর্বপ্রকার সংস্কার-মুক্ত বলে সর্বদাই গর্ব করে থাকি। কিন্তু এখনো নাট্য ও নৃত্যশিল্পীদের দূর থেকে প্রশংসা দিতে আমরা যতটা প্রস্তুত, আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে তাদের নিঃসংকোচে গ্রহণ করতে ঠিক ততটা প্রস্তুত হতে পেরেছি কি না সন্দেহ। নৃত্য ও নাট্য আজ

আমাদের প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের সমাজে আজও এরা স্বাভাবিক ও সহজভাবে গৃহীত হতে পারেনি। অথচ এককালে যে নৃত্য ও নাট্য আমাদের সমাজ-জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে বৃহত্তর ভারতে। এমন কি আমাদের ঘরের মধ্যেও মণিপুরী, সাঁওতাল প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায় এই সব শিল্পের সামাজিক চর্চা দ্বারা এসব ক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছে — যা আমরা আমাদের বিরাট ঐতিহ্য সত্ত্বেও পারিনি।

সঙ্গীত নৃত্য নাট্য প্রভৃতিকে এতকাল আমাদের সমাজ তামাসা বা আমোদের উপকরণ বলেই মনে করছে, রস-পিপাসু মনের উপ-লব্ধির খোরাক বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়নি। তা ছাড়া সম্ভ্রান্ত কিংবা অনধঃপতিত নারীদের দ্বারা এই সকল লোকচিত্ত-বিমোহন ললিত কলার চর্চা সমাজের অনুমোদন একেবারেই পায়নি। এরূপ অবস্থায় নৃত্য-গীত ও নাট্যাভিনয় সম্ভ্রান্ত মেয়েদের পক্ষে উন্মুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ যে কেবল তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভারই পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, এ তাঁর সর্বব্যাপী সত্যদৃষ্টিরই উদাহরণ।

আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের যে ঐতিহ্য ও পরিবেশ তাতে তার সংস্পর্শে আসবার সুযোগ, প্রবৃত্তি বা উপায় কোনোটাই রবীন্দ্রনাথের থাকবার কথা নয়, এবং বস্তুত ছিলও না। তবু সর্বমুখী প্রতিভা ও অভ্রান্ত দূরদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, শিক্ষিত ও বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি যদি নাট্যশিল্পের দিকে না আনা যায় তা'হলে আমাদের ললিতকলার এই অঙ্গকে পঙ্গু হয়েই থাকতে হবে।

অথচ যেহেতু নাট্যাভিনয় ও নাট্যসাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট এবং অভিনয়ের আঙ্গিক, নট-নটী এবং নাট্যাভিনয়ের পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে না পারলে নাটক রচনা যেহেতু শক্ত, সে কারণে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজস্ব ধারায় নাট্যানুষ্ঠানের এক-ঐতিহ্য প্রবর্তন করে যেতে হয়েছে। এই ধারার সঙ্গে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত নাট্যের প্রভেদ বিস্তর। সে কারণে রবীন্দ্রনাট্যে আমাদের পূর্ব প্রচলিত নাট্যসাহিত্যের ধারার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। এবং তাঁর নাটকের বিচারও প্রচলিত নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাট্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

"It should be pointed out...that Rabindranath has tried to keep himself scrupulously aloof from the professional Bengali stage. He has written and produced most of his plays independently. His dramatic work has developed along lines of its own, quite distinct from those which have hitherto marked the evolution of the main body of the Bengali drama. He has not written plays for the public but has rather created a public for his plays. So from a purely professional point of view his dramatic work may be said to have made very little impression on the ordinary Bengali play-goer, although its originality

and power of appeal are almot undisputed among those whom we may regard as the 'high brow' enthusiasts of the Bengali drama."

রবীন্দ্রনাট্যের প্রযোজক, পরিচালক, শিল্প-নির্দেশক, নৃত্য-পরিকল্পক, সঙ্গীত রচয়িতা ও নাট্যকাররূপে রবীন্দ্রনাথ নাট্যসাহিত্য ও নাট্যানুষ্ঠানের যে ধারা প্রবর্তন করেন, তার চূড়ান্ত বিকাশও রবীন্দ্রনাট্যেই। রবীন্দ্রতুল্য প্রতিভার সহায়তা ছাড়া সে পথে আর অগ্রসর হবার পথ নেই। কিন্তু আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে নাটকের প্রচলিত ধারা অনুসরণ করেই বড় হতে হবে, শুধু তাকে অর্জন করতে হবে শুচিতার মর্যাদা, বিদগ্ধ সমাজের অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা এবং আমোদের উপকরণমাত্র হিসেবে নয়, চারু শিল্প হিসেবে এর চর্চা ও অনুশীলন করবার মত মনোভাব। এদিক থেকে রবীন্দ্র-নাথের প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই যে আংশিকভাবে রঙ্গমঞ্চের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, এটা বোঝা যায়। ক্রমে নাট্যজগৎ তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির থেকে মুক্ত হয়ে সহজ স্বাভাবিক সাধারণ সামাজিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের থিয়েটারে ও নাটক খুব উঁচুস্তরে পৌঁছুবার ভরসা দেখি না।

৯

নাটকের উপাদান ও বেতার-নাট্য

আমাদের যেটা দৈনন্দিন জীবন — অধিকাংশ মানুষ যেভাবে ঘরোয়া সুখ-দুঃখ হাসি-খেলা, স্নেহ-মমতা, প্রেম ও বাৎসল্যকে ঘিরে আপাত-সাধারণ জীবন যাপন করে, তার মধ্যে কাব্যের উপাদানে যথেষ্ট থাকলেও নাটকের উপাদান কম। হৃদয়ের ভাবাবেগকে অপরের মর্মগ্রাহীরূপে পরিবেশন দ্বারা কাব্যরচনা হয় বটে, কিন্তু নাট্যরস সৃষ্টি হয় না। আমরা যেরূপ জীবন কাটাই তা বৃহৎ বৃহৎ ঘটনার দ্বারা খুব বেশি আলোড়িত নয়। তার অর্থ এ নয় যে ঘটনাসংকুল জীবনের তুলনায় আমাদের এ অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ জীবন মূল্যহীন। সাধারণ মানবজীবনে ঘটনার আলোড়ন কম হলেও ভাবাবেগ সমানই গভীর ও তীব্র। কিন্তু কেবলমাত্র আবেগ, অথবা অশরীরী ভাবের সংঘাতকে নাটকে রূপান্তরিত করা অসম্ভব। নাটকের পরিসর নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ, তার উপভোগ দৃষ্টি ও শ্রুতির অনুমোদনসাপেক্ষ। এ কারণে কেবলমাত্র ভাবের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষকে যখন নাট্যরূপ দিতে হয়, তখন সেই ভাবগুলিকে চরিত্ররূপে সাজিয়ে নিয়ে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারাই তাদের সংঘর্ষ ফুটিয়ে তুলতে হয়; তখন তাকে বলা হয় রূপক-নাট্য। ভাব বলুন, চরিত্র বলুন, জীবনের আশা-দ্বন্দ্ব, দুঃখ-ব্যর্থতা যাই বলুন, ঘটনার মধ্য দিয়েই নাটকে তা ফুটে ওঠে। কেবলমাত্র বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন

দ্বারা তা প্রকাশিত করতে গেলে, সে বস্তু সাহিত্য হতে পারে কিন্তু নাটক হয় না। ঘটনার পারম্পর্য দ্বারাই নাটক গড়ে ওঠে বলে আমাদের মধ্যে কারুর জীবনে যখন বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ দেখতে পাই, তখনই বলি — এই জীবন কি নাটকীয়! আবার ঘটনাই নাটকে গতি সঞ্চার করে, তাই যে নাটক ঘটনাহীন তা গতিহীন অনড় ও অচল বলে মনে হয়। এই কারণে বাগ্‌বিস্তারে সুনিপুণ হওয়া সত্ত্বেও অস্কার ওয়াইল্ডকে এই সান্ত্বনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল যে, "the play was a great success, but the audience was a failure."

সম্ভবত এই জন্যই আমাদের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারেরা রাজা-রাজড়ার কথা নিয়েই নাটক লিখবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের জীবনে এরূপ ঘটনা পারম্পর্য কমই আসে যা অপরের কৌতূহল ও আগ্রহকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে। অবশ্য বর্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব অংশত জনসাধারণের ঘাড়ে পড়ায়, জীবন অনেকটা জটিল হয়েছে। আর তা ছাড়া মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করবার মত ঘটনার প্রকৃতিও অনেকটা বদলেছে। যুদ্ধ, হত্যা, মৃত্যু, চক্রান্ত, নির্বাসন প্রভৃতি ছাড়াও মানবজীবনে উল্লেখযোগ্য বহু ঘটনা এখন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে নাটকে রূপান্তরিত করতে সমর্থ। তবু একথা মানতেই হবে যে, নাটক অর্থই ঘটনার পারম্পর্যের মধ্যে মানুষের আশা ও দ্বন্দ্ব, সুখ ও দুঃখের প্রতিফলন। এইজন্যই সুবিখ্যাত ইটালীয় নাট্যকার পিরান্দেল্লো বলেছেন, "Drama is action,

Sir, action. Not confounded philosophy" পিরানদেল্লো যাকে নাটকের ক্ষেত্রে "confounded philosophy" বলে অভিহিত করেছেন, তাই নিয়েই কথা-সাহিত্যে যে উৎকৃষ্ট বস্তু রচিত হতে পারে এবং হয়ে থাকে এরূপ প্রমাণের অভাব নেই। বস্তুত আজকাল উপন্যাসের গতিই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের দিকে। ঘটনার গতি দ্বারা যদি তা গতিশীল নাও হয়, মনের আবেগ ও সংঘর্ষের দ্বারাই তা চলমান। অধুনিক বাংলা উপন্যাসও এখন ঘটনা বাহুল্যের চেয়ে মানসদ্বন্দ্বের রূপায়ণের দিকে অগ্রসর। এক্ষেত্রে উপন্যাস হিসাবে একখানি বই প্রশংসিত হওয়া মাত্রই সেখানিকে নাট্যরূপে পরিবেশন করার যে ফ্যাশান ইদানিং দেখা দিয়েছে তা নিতান্তই অর্থহীন মূঢ়তা-সঞ্জাত বলে মনে না করে পারা যায় না। অবশ্য অনেক উপন্যাস এরূপ আছে যা নাটকীয় সমাবেশ ও নাটকীয় পরিস্থিতির অস্তিত্বের ফলে নাটকরূপে উপভোগ্য হবার খুবই যোগ্য। কিন্তু তাই বলে সব উপন্যাসকেই নির্বিচারে নাট্যরূপ দিতে চেষ্টা করতে গেলে তাতে না হয় দর্শকদের উপর সুবিচার, না লেখকের প্রতি।

পূর্বকালে মানব-জাতির চিত্তবিনোদনের জন্য যে সব উপকরণ, আয়োজন ও কারুশিল্প পরিকল্পিত হয়েছিল তার পরিবেশন হোত একাধিক ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্যরূপে। গায়ক গায়িকা যখন সামনে বসে গান গাইতো, তখন তাদের মধুর কণ্ঠস্বরই যে কেবল আনন্দ জোগাতো তা নয়. সঙ্গীতের উল্লাস ও বেদনা, মিনতি ও অভিমান শিল্পীর মুখে চোখে অভিব্যক্ত হোত, এবং শ্রবণের উপভোগ দৃষ্টির উপভোগের সমর্থনে আরো বেড়ে যেত। শুধু কি তাই? সে-সব

সঙ্গীতের আসরে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তুষ্টিবিধানের জন্য থাকতো সুরভি ধূপ অগুরু ও গুগ্‌গুল, এমন কি রসনার তৃপ্তিদানের ব্যবস্থা থাকতো বলে অনুমান করাও অসঙ্গত নয়। ওমর খৈয়াম 'মৌন ভাঙি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর', হলেই ধরায় স্বর্গ রচিত হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন বটে কিন্তু তিনিও খাদ্য এবং সুরার পেয়ালার কথা ভোলেননি। নর্তকীর নৃত্যকলা ও মুদ্রাকৌশল দেখেই শুধু তৃপ্তি হয় না, তার পায়ে তালে তালে ঘুঙুর বাজা চাই, আর চাই উপযুক্ত বাজনা-সঙ্গৎ। নাট্যাভিনয় দেখতে গিয়ে কেবল কি অভিনেতাদের চলাফেরা ও মুখভঙ্গিমায় ভাবের অভিব্যক্তি দেখেই তৃপ্তি হয়? সঙ্গে সঙ্গে কথার বিন্যাস ও কাকু-তেও যিনি সবচেয়ে সুন্দররূপে ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তাঁর অভিনয়েরই আমরা সুখ্যাতি করি। নাটকে আমরা শুধু সুন্দর মুখই দেখতে চাই না, সুন্দর কণ্ঠস্বরও শুনতে চাই। আবার শুধু ভালো ভালো কথার সুন্দর আবৃত্তি শুনে মন ভরে না, — তাহলে তো বক্তৃতা শুনলেই পারি। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা বিভিন্ন চরিত্রের সংঘর্ষে যে আবেগের ঢেউ ওঠে, সেই ঊর্মিতে অবগাহন করতেই আমরা ভালবাসি।

আমাদের নাটকের কথা ভাবতে গিয়েই এত কথা মনে হোল। বিশেষ করে মনে হচ্ছিল বেতার-নাট্যের কথা।

মানুষের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে যতই সূক্ষ্ম ও উন্নত করে তুলছে, ততই সর্বক্ষেত্রে চলেছে বিশ্লিষ্টীকরণ, বিভক্তীকরণ। বস্তুত আধুনিক উন্নত সভ্যতা মানুষকে নিয়ে চলেছে সমন্বয়ের দিকে নয়, খণ্ডন ও বিশ্লেষণের দিকে। আগেকার দিনে একজন

ছুতোরকে বল্লে সে একটা গোটা টেবিল তৈরি করে দিতে পারতো। কিন্তু আজকাল একটা টেবিল তৈরি করতে হয়তো ছ'জন বিশেষজ্ঞ লোকের দরকার হবে। একজন হয়তো শুধু খুব ভালো করে টেবিলের পায়া গোল করে কাটতেই শিখেছে, সেইজন্যই তার বেশি খাতির। পালিশের ওস্তাদকে ইস্ক্রুপ আঁটতে বল্লে হয়তো সে আঁৎকে উঠবে। সর্বক্ষেত্রেই এইরূপ। ডাক্তারী শাস্ত্রের চর্চা এইরূপ বিশেষীকৃত হয়েছে যে, কারুর যদি একই সঙ্গে কান কট কট্ করে ও বুক ধড়ফড় করে তবে দুজন ডাক্তারের কাছে না গিয়ে তার আরোগ্যের আশা নেই। শোনা গেছে কোনো এক সেকেলে সর্বরোগের চিকিৎসক নাকি প্রত্যেক রোগেরই বিশেষজ্ঞ দেখে দেখে এরূপ বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে এক নতুন ডাক্তার কর্ণরোগের বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছেন শুনে জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলেন— 'ডান কান না বাঁ কান ?'

চিত্ত-বিনোদনের উপকরণের ক্ষেত্রেও যে এই বিশেষীকরণের ব্যতিক্রম হয়নি, তার প্রমাণ নীরব ও সবাক ছায়াচিত্র, গ্রামোফোন ও রেডিওর পরিবেশন-বৈচিত্র্য। আগে সংগীত ও নাটক এবং তাদের পরিবেশন ছিল দৃষ্টি শ্রুতি ইত্যাদি বহু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ্য, এখন গ্রামোফোন ও রেডিওর মারফৎ তাদের গ্রহণ করবার একমাত্র পথ শ্রবণেন্দ্রিয়। নীরব সিনেমায় উপভোগ ছিল শুধুই দৃষ্টির মধ্যস্থতায়। আবার গ্রামোফোন ও রেডিওর পক্ষে মানব মনে প্রকাশ করবার একটিমাত্র পথ খোলা আছে— সে হচ্ছে কান। এখানে মুখে চোখে যথাযথ ভাব ফুটিয়ে তুলে অভিনেতা তাঁর

বক্তব্যকে আরো মর্মস্পর্শী করে তুলতে পারেন না। একারণে যে নাটক মঞ্চের উপযোগী, তা বেতারেও আনন্দ দেবে এটা নেহাৎই ভুল ধারণা। মঞ্চের নাটককে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করলেও যে তা সমান প্রীতিকর হবে, এরূপ প্রমাণ নেই। আবার দৃশ্য শ্রাব্য এবং পাঠ্য কাহিনী অথবা থিয়েটার সিনেমা রেডিওর নাটক আর কথা-সাহিত্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। শুধু যে মানবমনে প্রবেশের পথ ও পদ্ধতিই এদের বিভিন্ন তা নয়, রসস্রষ্টার পক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে নিজেকে প্রকাশ করার উপায়ও এতই পৃথক যে, যিনি ভালো উপন্যাস লিখতে পারেন, তাঁর পক্ষে ভালো নাটক লিখতে পারা অনেক সময়ই দুঃসাধ্য। আবার উপন্যাস হিসেবে যা উৎকৃষ্ট ও উপভোগ্য, নাট্যাকারে তা হয়তো একেবারেই অচল। যে সব উপন্যাস বর্ণনা ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের কৃতিত্বে সুখপাঠ্য তাকে নাট্যাকারে মঞ্চস্থ করতে গেলে থাকবে শুধু বড় বড় বক্তৃতার সমাবেশ। কান তাকে গ্রহণ করলেও চোখ অনুমোদন না করাতেই সে অচল হয়ে যাবে। আবার বাকচাতুর্য ও চারিত্রিক ঘাত-প্রতি-ঘাতের দ্বারা যে নাটক মঞ্চে উৎরোতে পারে তাকে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করতে গেলে তদনুরূপ সুফল পাওয়া শক্ত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রস-পরিবেশনের বিভিন্ন মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষত নাটক ও সঙ্গীত আগে যেরূপ বহু ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য ও উপভোগ্য ছিল, এখন গ্রামোফোন রেডিওতে সেরূপ হবার উপায় নেই। নতুন মাধ্যমে যদি এ সব শিল্পের রস পরিবেশন করতে হয়, তাহলে মাধ্যমের উপযোগী করেই শিল্পকে গড়তে হবে।

তাই মঞ্চে, সিনেমায় ও রেডিওতে যা অভিনীত হয় তার সবই নাটক নামধারী হলেও একই জিনিস যে সবক্ষেত্রেই পরিবেশন করা সঙ্গত তার কোনো মানে নেই। অথচ, বর্তমানে বাঙলাদেশে একখানি উপন্যাস একটু খ্যাতিলাভ করলেই তা নাট্যাকারে মঞ্চ, সিনেমা ও রেডিওতে একবার করে পরিবেশিত হয়। যেন ও ছাড়া আর গতি নেই।

যা দৃশ্য ও শ্রাব্য রূপে দুই ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করে তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে, তা কেবলমাত্র শ্রুতির মাধ্যমে উপভোগ করা যে সব সময় সম্ভব নয়, একথা বেতার পরিচালকগণের হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। চোখের কাছে যে ঘটনা বাস্তব ও সত্য, কানের কাছে তার অস্তিত্বই না থাকতে পারে। দেখাতে যা কৌতূহল উদ্রেক করে, শোনাতে তা একেবারেই ভালো না লাগা মোটেই আশ্চর্য নয়।

যেমন কিনা, যাত্রা-থিয়েটারে অভিনেতা যখন বাহ্বাস্ফোট, অসি-আস্ফালন কিংবা ভ্রূভঙ্গি করেন অথবা দর্শনীয়ভাবে প্রবিষ্ট বা নির্গত হন, তখন ঘন ঘন করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখর হয়ে ওঠে। ভীম কিংবা হনুমান সংবলিত নাটকে সগুম্ফ ও স-ভুঁড়ি (যদিও ভীম মাকুন্দ ছিলেন বলেই মহাভারতে কথিত আছে) ভীমের কুন্দন আর রামভক্তের লম্ফ-ঝম্পটাই তো আসল। ঐ দেখেই তো অধিকাংশ দর্শক মনে করে প্রবেশ-মূল্য উঠে গেল। কিন্তু হায়! বেতারে ঐরূপ লম্ফ ঝম্প নর্তন কুন্দন দেখাবার সুযোগ কোথায়? এমন কি একজোড়া প্রমাণ সাইজ গোঁফ ও বিরাটাকার গদার সহায়তায় ভীমের বিক্রম সম্বন্ধে শ্রোতার মনে প্রথম থেকেই একটা সমীহ

জাগানোই তো অসম্ভব। এক্ষেত্রে ভীমের বীরত্ব প্রকাশের একমাত্র উপায় তাঁর কণ্ঠস্বর। এরূপ অবস্থায় ভীমের পক্ষে খণ্ডিত-গৌরবে রেডিও-নাট্যে আবির্ভূত না হওয়াই সঙ্গত। কেবলমাত্র বাক্যের গদাপ্রহারে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের চেষ্টা করে লাভ নেই। ওতে মজা পাওয়া যাবে না।

অপরপক্ষে কানের পক্ষে যা ঘটনা, শ্রবণে বা কৌতূহল উদ্রেক করে, চোখের কাছে তার বিশেষ কোনো মূল্য না থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। মোটর গাড়ি চলার আওয়াজ, কড়ানাড়ার শব্দ, ট্রামের চাকার ঘর্ঘর, লোকের দ্রুত কিংবা মন্থর পদধ্বনি, বাসন নাড়ার বা ভাঙার শব্দ, পশুপক্ষীর ডাক, বন্দুকের আওয়াজ, উচ্চহাস্য কিংবা সরবে রোদন — এই সবের মধ্য দিয়ে কানের ঔৎসুক্য জাগতে পারে। কিন্তু থিয়েটার দেখতে গিয়ে কে আর পদশব্দ কিংবা ট্রামের আওয়াজ শুনতে চায়? কাজেই বিজ্ঞান যখন আমাদের উপভোগের একটা নতুন বাহন দিয়েছে তখন তার উপকরণও তৈরী করতে হবে তার উপযোগী করে। রেডিও নাটকও হবে শব্দ দ্বারাই বেশি পরিমাণে অভিব্যক্ত। নইলে কান তাকে নেবে কেন? কানের ভিতর দিয়ে তা মরমেই বা প্রবেশ করবে কী উপায়ে?

বর্তমানে যে ধারণা রেডিও পরিচালকদের মধ্যে প্রচার ও প্রসার লাভ করছে তা হচ্ছে এই যে, যে-কোনো উপন্যাস বা নাটকের কথোপকথন অংশকে বেতারে প্রচারিত করলেই তা বেতার-নাট্য হয়। বেতারনাট্য রচনা যে একটা সম্পূর্ণ পৃথক শিল্প, যাতে শ্রবণের মধ্য দিয়েই ঘটনা ও আবেগের ঘাত-প্রতিঘাত প্রকাশিত হবে

এটা যেন ঠিক কেউ উপলব্ধি করছেন না। বেতার-নাট্য রচনার জন্য যে নতুন আঙ্গিকে তালিম দিয়ে দক্ষতা অর্জন করা দরকার, মোটামুটি লিখতে জানলেই যে চলে না, এ কথা কেন যে কেউ হৃদয়ঙ্গম করেন না সেটাই আশ্চর্য। বিশেষত ছায়াচিত্রের ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখেছি যে, চিত্রনাট্য লিখতে পারাটা এক বিশেষ ধরণের কৃতিত্ব। খুব ভালো মঞ্চের নাটককেও সেই বিশেষ আঙ্গিকে ঢেলে না সাজলে চলে না; আর এও যখন আমরা দেখছি যে, রেডিও নাট্যরূপে এক বিশেষ ধরণের রচনা অন্যান্য দেশে শ্রাব্য-নাটককে অপূর্ব কৌতূহলময় করে তুলতে সমর্থ হয়েছে, তখন আমাদের পক্ষে রেডিও-নাট্য নামে পরিবেশিত নিছক বাক্যালাপ শোনবার প্রয়োজন কী? অন্যান্য দেশের সহজলভ্য আদর্শকে সামনে রেখে খুব সাধারণ সাহিত্যিকও এই বিশেষ ধরণের আঙ্গিকে দক্ষতা লাভ করতে পারেন। আর, উপযুক্ত লোক বেছে নিয়ে তাঁদের এই ধরণের রচনায় শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বও বেতার-কর্তৃপক্ষেরই। যাকে তাকে দিয়ে যে কোনো উপন্যাস বা নাটকের বেতার-নাট্যরূপ লিখিয়ে নেওয়া কোনোক্রমে দায় শোধ করা ছাড়া আর কী?

১০

আমাদের গাম্ভীর্য

এ কথা বল্লে আশাকরি কেউ বিরূপ হবেন না যে, আমরা জাতিটি বড়ই গুরুগম্ভীর এবং বেশ যথেষ্ট পরিমাণে শুচিবাইগ্রস্ত। নাচ, গান, নাটক ইত্যাদিকে সামাজিক ছুঁৎমার্গে কোণঠাসা করে রাখতে চেষ্টার কোনো ত্রুটিই আমরা করিনি। আর নাচ-গান তো বড় কথা, যে কোনো রকম ফুর্তি করার নাম শুন্‌লেই তো আমাদের লম্বা মুখ আরো লম্বা হয়ে আসতে চায়। দৈনন্দিন জীবন থেকে আমোদ-প্রমোদকে যতটা দূরে রাখতে পারি ততই আমরা আত্মপ্রসাদ পাই, অন্যান্য দেশবাসীর মত প্রায়শঃই জীবন ও মনকে লঘুরসে অবগাহন করিয়ে সঞ্জীবিত করতে আমরা জানি না। পিতা বা অভিভাবকরূপে সন্তানকে শাসন করাই সন্তানের চরিত্রগঠনে একমাত্র পৈতৃক দায়িত্ব বলে আমরা মনে করে থাকি। ছেলে-মেয়েরা অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 'অতিরিক্ত' মেশামেশি করে বা 'আড্ডা দেয়' এটা আমরা দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আর যদি আমরা কেউ জীবনে বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব অর্জন করতে পারি, তৎক্ষণাৎ জনসমক্ষে মুখখানাকে যথাসম্ভব হাঁড়ি-সদৃশ করে তুলতে আমরা যত্নবান হই। এমন কি আমরা ঠাট্টায় চটি ও বিদ্রূপে অগ্নিশর্মা হই। তবে, কালে ভদ্রে, তেমন তেমন উপলক্ষ্য পেলে আমরা আঁটঘাট বেঁধে তোড়জোড় করে বিরাট রকমের ফুর্তি করতে চেষ্টা করি। তাতে হাজারখানেক

নিমন্ত্রিত তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টি নিয়ে আবির্ভূত হন, এবং তারপর ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ও বিরক্ত বিতৃষ্ণ মনে বেশ কিছুদিন ধরে সেই প্রাণান্তকর ফুর্তির জের টেনে টেনে আমাদের দিন চলে। এরূপ ক্ষেত্রে সুকুমার রায় যে রামগরুড়ের ছানা ও হুঁকো-মুখো হ্যাংলা সম্বন্ধে পদ্য লিখবেন এতে আর বিচিত্র কী ?

সাহিত্যকে সাধারণত সমাজের দর্পণরূপে গণ্য করা হয়, কেন না সামাজিক রীতি-নীতি এবং সামাজিক মনোভাব সাহিত্যেই সবচেয়ে স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আমাদের সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সেখানে হাস্যরসাত্মক রচনা অতিস্বল্প এবং হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের মর্যাদা ততোধিক সামান্য। বিশুদ্ধ হাস্যরস বাংলাসাহিত্যে খুব বেশি লোক পরিবেশন করেন নি, কিন্তু যাঁরা করেছেন তাঁদের অনেকেরই নাম অধিকাংশ বাঙালী জানে না। বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস যাঁরা দিয়ে গেছেন, তাঁদের ভাগ্যও তার চেয়ে বিশেষ লোভনীয় নয়। হেমচন্দ্রের নাম করতে মহাকবি বলে বিগলিত হয়ে সকলেই বৃত্রসংহারের উল্লেখ করেন (যদিও তা সম্পূর্ণ পাঠ করেছেন এরূপ ব্যক্তি বর্তমান লেখক কমই দেখেছেন), কিন্তু তাঁর যে ক'টি ঠাট্টার কবিতা আছে তার নামোল্লেখও কেউ করেন না। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে যেটুকু মজা আছে, সেটুকু বাঙালী পাঠক প্রায় ভুলে গেছে বলে' আশঙ্কা হয়। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ইদানীং আবার মনে করিয়ে দেওয়া যাচ্ছে মাত্র। স্বর্গত ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরম উপভোগ্য লঘু রচনাগুলি বাঙালী পাঠক সমাদর করলে নিশ্চয় তা বাজারে

কিনতে পাওয়া যেত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গে তাঁর 'হসন্তিকা'র উল্লেখ সম্প্রতি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষার কাব্য' 'বসন্তের কাব্য' 'জীবন দেবতা' নিয়ে বহু আলোচনা সর্বত্রই দেখা যায়, কিন্তু তাঁর লঘুরসাত্মক গ্রন্থ ও রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা চোখে পড়ে নি। মোদ্দা কথা, আমাদের মনোভাব হচ্ছে এই যে, জীবনে অবিচলিত গাম্ভীর্যের ফাঁকে ফাঁকে কখনো কখনো উচ্ছ্বাসে বিগলিত হতে পারাটাই সংস্কৃতিপরায়ণতার লক্ষণ। এরূপ একটি গুরুগম্ভীর জাতির পক্ষে নৃত্য, নাট্য, সংগীত প্রভৃতি চিত্তবিমোহন ললিতকলাগুলির সম্বন্ধে একটা পরম অবজ্ঞাময় ঔদাসীন্য বহন করা একেবারেই বিচিত্র নয়। এবং এরূপ ক্ষেত্রে এই সব শিল্পকলা যে এ দেশে এতদিনেও পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করতে পারেনি এতেও আশ্চর্য হবার কিছু দেখি না।

বস্তুত, হাস্যরসাত্মক অথবা যে-কোনো প্রকার লঘু সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের সংস্কৃতি-গর্বিত শিক্ষিতম্মন্য এক শ্রেণীর লোকের অবজ্ঞা ও অনুকম্পার সীমা নেই। আর, কেবল সাহিত্যই নয়, জীবনের যে কোনো প্রকার লঘু ও সাধারণ চিত্তবিনোদনের উপায় সম্বন্ধেই আমাদের তথাকথিত কৃতী ব্যক্তিরা সন্দিগ্ধ ও সন্ত্রস্ত। যেমন ধরুন, আমার জনৈক বন্ধু আমাকে হিতোপদেশ দিয়েছেন যে, গোয়েন্দা কাহিনী পড়াতে মানসিক অবনতি ঘটে, অতএব ও-জিনিস যেন আমি আর না পড়ি। এই বন্ধু আমার মানসিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ উত্তুঙ্গ ধারণা পোষণ করেন যে, তাঁর ভয় গোয়েন্দা-গল্প জাতীয় নিচুদরের জিনিষ পাঠ করে আমার মন পুরাণোক্ত উপরিচরের মতো

করে না জানি অধঃপতিত হয়ে যায়। বন্ধুটি আমাকে আরো অনেক 'হীন' কাজ থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন — যথা ফুটবল খেলা দেখা, তাস খেলা ইত্যাদি। আমার এই উচ্চস্তরের বন্ধু কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা এখন বহু উর্ধ্বে উঠে গেছেন। নিজেকে সর্ব-প্রকার 'হীন'-সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে নিজের রুচি ও সাহিত্যবোধকে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল এবং অবিমিশ্ররূপে উঁচুস্তরের করে তুলতে তাঁকে নিশ্চয়ই বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কেননা, এটা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, ছোটবেলা থেকেই তাঁর ডিটেক্‌টিভ গল্প, তাস খেলা, ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা ইত্যাদিতে কোনই লোভ কিংবা ঔৎসুক্য ছিল না।

আমার এই বন্ধু একজন লেখক। তাঁর রচনার ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করে সর্বদাই আমার ভয় হয় যে, যে সব জিনিস তিনি অসাধারণত্ব লাভের দুরূহ সাধনায় বর্জন করে এসেছেন, তারাই তাঁর রচনাকে পাছে অসম্পূর্ণতায় খর্ব করে রাখে।

এ-বিষয়ে আমার নিজের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, যে সবমানবের মনকে যদি সাধারণ বলে অভিহিত করা যায়, তবে সেই সাধারণত্বের স্তরে নিজের মনকে বিচরণ করাতে না পারলে কোনো প্রতিভাই পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে না। বস্তুতঃ সকলপ্রকার রস উপভোগ করবার ক্ষমতারই অপর নাম বৈদগ্ধ্য। আর, সব মানুষের মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হতে না পারলে সর্বমানবের মনের কথা বোঝাও সম্ভব নয়, লেখাও সম্ভব নয়। যে লোক দার্শনিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তাকে হাল্কা হাসির আনন্দ থেকে বঞ্চিত

থাকতে হবে এমন কোনো মানে নেই। বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব বোধগম্য করেন বলেই বৈজ্ঞানিকের পক্ষে প্রেম করতে বাধা থাকবে কেন? সব মানুষের মনই সব কিছু চায়, কোনো মানুষের মনই এক প্রকোষ্ঠে বন্ধ থাকতে পারে না, থাকতে চায়ও না। জীবনের সর্বমুহূর্তেই আমরা কেউ কবি কিংবা দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক নই। কখনো প্রেমিক, কখনো ফূর্তিবাজ রসিক, কখনো ভাবুক, কখনো ভীত, কখনো ক্রুদ্ধ, কখনো বিষণ্ণ ও কখনো অবসন্ন হওয়া মানুষের স্বভাব। সেই জন্যই মানুষ কখনো আড্ডা দেয়, কখনো খেলে, কখনো হাসতে চায়, কখনো কবিতা পড়ে, কখনো গেয়েন্দা কাহিনী পড়ে, কখনো সিনেমা দেখে এবং কখনো গানবাজনা শোনে। গেয়েন্দা কাহিনী পড়াও ক্লান্ত মস্তিষ্কের এক খেলা কিংবা বিশ্রাম; এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই বিশ্রাম ও খেলা উভয়ই প্রয়োজন।

গোয়েন্দা কাহিনী সম্বন্ধে আমার একটু দুর্বলতা আছে, স্বীকার করি। সত্যিকারের ভালো ডিটেক্‌টিভ গল্প পড়তে আমার বেশ ভালোই লাগে। সারাদিনের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে স্নান ও চা-পানের পর এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নিয়ে বসলে বহু জ্ঞানার্জন হতে পারে জেনেও একটি উৎকৃষ্ট ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস নিয়ে শুয়ে পড়তে আমি বেশি পছন্দ করি — এ দুর্বলতা অকপটেই স্বীকার করছি। যদিও একথাও বলতে হবে যে, গোয়েন্দা-কাহিনী যদি অতি উৎকৃষ্ট স্তরের না হয়, তবে তা পড়াই যায় না। নিকৃষ্ট প্রেমের কাহিনীর মতই প্রায় তা অপাঠ্য ও বর্জনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষ — বিশেষত বর্তমান যুগের মানুষকে প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের

পর থেকেই কাজের জোয়াল কাঁধে নিয়ে ঘুরতে হয়। কাজটা কারখানাতেই হোক বা টেবিল চেয়ারেই হোক, সাড়ে পনেরো আনা লোকের পক্ষেই কাজটা প্রীতিপ্রদ নয়, বস্তুত রীতিমত অপ্রীতিকর। তদুপরি ইদানীন্তন জীবনযাত্রায় পদে পদেই উদ্বেগ, অশান্তি ও অস্বস্তি ভোগ না করে উপায় নেই। এরূপ ক্ষেত্রে মনটাকে মাঝে মাঝে অনতিসূক্ষ্ম, অনতিগভীর, অনতিজটিল হাল্কা খেলায় মাতিয়ে দিয়ে চাঙ্গা করে নেওয়া ভালো। পূর্বকালে যখন জীবন এত জটিল ছিল না, জীবনে এত অস্বস্তি ও অশান্তির পেষণও ছিল না, তখনও সমবেতভাবে গান বাজনা নাচ ও মদ্যপানাদির দ্বারা মনকে সঞ্জীবিত করে নেবার প্রথা ছিল। এখন রাষ্ট্রপরিচালক ধর্মপুত্র মাস্টার মশাইদের শাসন সত্ত্বেও এই প্রথা বহুলোকের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। আমরা যারা অতিরিক্ত সংস্কৃতিপরায়ণ বলে নিজেদেরকে বর্ণনা করতে ভালোবাসি, তারা অনেকে মদ্য ও তদীয় আনুষঙ্গিক নেশাগুলিকে পরিবর্তিত করে হাল্কা-সাহিত্য পাঠে রূপান্তরিত করেছি মাত্র। গোয়েন্দা কাহিনী ভূতের গল্প কিংবা হাসির গল্প-কবিতা পড়া তারই এক উদাহরণ।

১১

হিতোপদেশ ও বক্তৃতা

মানুষ যে শুধু নিজের চেহারাটাই সব সময় দেখতে পায় না, তা নয়। নিজের স্বভাব-চরিত্র, দোষ-গুণ, অভ্যাস ও প্রবৃত্তি সব কিছু সম্বন্ধেই সে সাধারণত অচেতন থাকে। মাঝে মাঝে যেমন লোকে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নেয়, তেমনি কখনো-সখনো কালেভদ্রে মানুষ হয়তো নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করে নিজের চরিত্রটি অস্পষ্টভাবে অনুধাবন করে মাত্র। নিজের দিকে তাকাতে গেলেই মানুষের দৃষ্টিশক্তি বিকৃত হয়ে যায়, দোষ ত্রুটিগুলো হয়ে যায় অস্পষ্ট, ক্ষীণ, আর গুণগুলো বড় আর জমকালো হয়ে দেখা দেয়। অন্যের বেলায় কিন্তু হয় একেবারেই উল্টো। দোষগুলোই দৃষ্টি ও মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, গুণ-টুন সহজে চোখে পড়তে চায় না।

এ কারণে আমরা নিজেরা যে যাই হই না কেন, অপরকে হিতোপদেশ দেবার প্রবৃত্তি আমাদের মজ্জাগত। সুযোগ পেলেই, এবং অনেক সময় সুযোগ না পেলেও, কাউকে ধরে তার কানে খানিকটা উপদেশামৃত বর্ষণ করতে পারলে আমরা ভারি খুশি হই। 'আরে আরে ওকি কর প্যালারাম বিশ্বাস', বলে যে ব্যক্তি আত্ম-প্রসাদ লাভ করতে চায়, সে আমাদের সকলেরই চেনা, আপন লোক, এমন কি আমাদের সঙ্গে একাত্ম বল্লেও হয়। আমরা প্রত্যেকে যথাসুযোগ এবং যথাশক্তি উপদেশ দিই, কিন্তু তাই বলে

আমাদেরও যে সেই সব উপদেশ অনুযায়ী চলতে হবে, একথা আমরা মানিনে।

আমাদের আর একটি দুর্বলতা এই যে, হিতোপদেশদাতাদের আমরা ভারি খাতির করি, আর সমীহও করি মন্দ নয়? এই হিতোপদেশ দান ও হিতোপদেশ-গ্রহণ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার জন্য আমরা সুযোগ পেলেই বক্তৃতার আয়োজন করি। যে কোন প্রকারের অনুষ্ঠানে কিছু কিছু নামজাদা লোক সংগ্রহ করে তাদের দিয়ে বক্তৃতা দেওয়াতে না পারলে কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি হয় না।

সভায়, সমিতিতে, ভোজে, সম্মিলনে, গৃহ বা কোনো নব প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনে ও সমবেত শোকপ্রকাশে কিছু বক্তৃতা চাইই চাই। গ্রহবৈগুণ্যে এইরূপ কয়েক শ' বক্তৃতা ইতিমধ্যেই আমাকে শুনতে হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, বক্তৃতা শোনায় বিন্দুমাত্র মজা নেই, বক্তৃতা শোনাতে কিছু লাভ হয় না, এমন কি বক্তৃতা শোনার ফলে যে আমাদের সাংস্কৃতিক বা চারিত্রিক বিশেষ উন্নতি হয় একথাও হলপ্ করে বলা মুস্কিল। তবু বক্তৃতা সম্বন্ধে মোহ আমাদের অসাধারণ। যে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজনই আমরা করি না কেন, কয়েকজন বক্তা সংগ্রহ না করা পর্যন্ত কিছুতেই আমরা শান্তি পাই না। সভা কিংবা সম্মিলনের আয়োজন করে শেষ মুহূর্তে যদি দেখা যায় যে বক্তৃতা দেবার লোক ক'টি অনুপস্থিত তাহলে ট্যাক্সি মোটর নিয়ে নামজাদা লোকদের বাড়ি বাড়ি ছুটোছুটি করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।

অথচ বক্তৃতা শুনতে কারুরই যে খুব ভালো লাগে এমন মনে হয় না। অবশ্য খুব উঁচুদরের বাগ্মিতা যা শ্রেতাদের মনে উন্মাদনা

সঞ্চার করে তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়, সে জাতীয় বক্তৃতার কথা বলছি না। স্বদেশী আন্দোলনে বক্তৃতার কৃতিত্ব ছিল অনেকখানি। কিন্তু সে রকম বক্তৃতা আর আমরা পাচ্ছি কোথায়? বার্ক, সুরেন বাঁড়ুজ্যে কিংবা বিপিন পাল রোজ রোজ হাজারে হাজারে জন্মায় না, অহরহ তাঁদের বক্তৃতা শোনবার সুযোগ ঘটা অসম্ভব। যে জাতীয় বক্তৃতা যে কোনো অনুষ্ঠানে গেলেই আমাদের কেবলি শুনতে হয় সে হচ্ছে বৈশিষ্ট্যবর্জিত উপদেশবারির একঘেয়ে শ্রাবণ-বরিষণ। সাধারণত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নামজাদা লোকেরাই এ সব বক্তৃতা দিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু যিনি বিজ্ঞানে পণ্ডিত কিংবা ভালো কবিতা লিখতে পারেন, তিনি যে বক্তৃতাতেও বিপিন পালের সমকক্ষ হবেন এ ধারণার ব্যাপক বিস্তারের আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাই না।

বক্তৃতা দিতে অর্থাৎ অন্যকে উপদেশ দিতে সব মানুষই ভালোবাসে বটে, কিন্তু ভারতীয়রা যেন আবার অতিরিক্ত মাত্রায় বক্তৃতা-প্রবণ। ইংরেজদের ভোজসভায় বক্তৃতা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। কিন্তু সেখানে খাওয়াটা আগেই ভালো ভাবে হয়ে যায় বলে মেজাজ-মর্জি ভালো থাকে, বক্তৃতা শোনার কষ্ট অতটা গায়ে লাগে না। তা ছাড়া সে সব বক্তৃতার সময় একটু ঘুমিয়ে নিতে বাধা নেই। তবুও ভোজ-পরবর্তী বক্তৃতা দীর্ঘ হলে লোকে যে কীরূপ বিরক্ত হয়, তা অসংখ্য ইংরেজী রসিকতাতেই প্রকট।

যে কথা বলছিলাম। সাধারণ সভায় সমিতিতে এবং বিবিধ অনুষ্ঠানে যে সব বক্তৃতা হয়ে থাকে, তা যখন কেউ উপভোগ করে না এবং তা দ্বারা শ্রোতারা (যারা ভালো করে শোনে না এবং না শুনতেই

চেষ্টা করে) যখন বিশেষ উপকৃতও হয় না, তখন বক্তৃতার সংখ্যা যদি দেশ থেকে কিছু ছাঁটাই করা যায় তাহলে দেশের গুরুতর ক্ষতি হবে বলে আশংকা করি না।

ধরুন সভাসমিতি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা না হলে যখন চলেই না, তখন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বক্তৃতার সংখ্যা একটি কিংবা বড় জোর দুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে দোষ কী? প্রত্যেক বক্তৃতার জন্য সময়ের একটা সীমা বাঁধা থাকলেই বা মন্দ হয় কী? তাহলে অন্তত সমবেত ব্যক্তিগণ জানতে পারে যে, বক্তৃতার পরবর্তী সঙ্গীতাদি অন্যান্য উপভোগ্য অনুষ্ঠান শোনবার আগে আর কতক্ষণ এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।

বিলাতে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন যে-সব বেকার যুবক হাইড পার্কে সাবানের বাক্স ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে গরম গরম বক্তৃতা শুরু করে দেয়, তাদের চারপাশে ছোটখাট ভিড় জমতে দেরি হয় না। এদেশেও সভা আর বক্তৃতার নাম শুনলেই লোকে সেদিকে ছোটে। অথচ কোনো বক্তৃতাই যে কেউ ভালো করে শোনে কিংবা হৃদয়ঙ্গম করে তা নয়। উপদেশ দান এবং উপদেশ আহরণ দুটো স্পৃহাই মানুষের প্রবল হলেও বড়ই ক্ষণস্থায়ী।

আমাদের জীবন যে অধুনা বক্তৃতাভাবে ক্রমশই দুর্বহ হয়ে উঠছে সে সম্বন্ধে কাউকেই উচ্চবাচ্য করতে দেখি না। সভাসমিতি তো আছেই, তদুপরি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সম্মেলনেরও কমতি নেই। তারও উপর বেতারযন্ত্র এবং ছায়াচিত্রও বক্তৃতায় বক্তৃতায় কণ্টকিত। চারদিককার বক্তৃতার বানে প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমার মত যারা বক্তৃতা

দিতেও চায় না শুনতেও চায় না তাদের পক্ষে হিতোপদেশামৃতের বর্ষণ থেকে গা বাঁচিয়ে চলাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি রাষ্ট্রের কিংবা সমাজের কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নই। এমন কি, রাজ্য, প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, মহকুমা বা পল্লীর ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীও নই যে সাহিত্য, শিল্প, শরীরচর্চা, স্বাদেশিকতা পল্লী-উন্নয়ন, শহর-উন্নয়ন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সভাতে সভাপতিত্ব করবার জন্য আমার ডাক পড়বে। কেবল তাই নয়, আমাদের দেশে যে সব প্রাতঃস্মরণীয় কৃতী মহাপুরুষ জন্মেছেন, তাঁদের জন্মদিন, তিরোভাবদিন ও স্মারক সভাতেও সভাপতি বা বক্তা হিসেবে আমার ডাক পড়বার কোনোই সম্ভাবনা নেই। আমি একজন নগণ্য সাহিত্যিক। সাহিত্যের সম্রাট, করদরাজা বা উজির-নাজির হবার বিন্দুমাত্রও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করি না। এক্ষেত্রে সভা ও বক্তৃতা থেকে শত হস্ত দূরে থেকেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার ভরসা রাখি।

ধরুন আজ থেকে গত এক বৎসরের মধ্যে বাঙলা ও ভারতের সকল জীবিত ও মৃত মহাপুরুষেরই জন্মদিন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সকল নমস্য ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কবি, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ দার্শনিক, কেউ সমাজ-সংস্কারক, কেউ শিক্ষাব্রতী, কেউ অহিংস নেতা, কেউ কূটবুদ্ধি নেতা, কেউ কৃতী রাজপুরুষ, কেউ বিপ্লবী শহীদ্ এবং কেউ বা লোকহিতকর বদান্য উদারহৃদয় ধনী। এঁরা প্রত্যেকেই আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এই এক বছরে আজকালকার সমাজ ও গোষ্ঠীর নেতৃ-

স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তিকে এসব মহাপুরুষদের স্মারকসভার প্রত্যেকটিতেই ঘুরে ঘুরে সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা করতে দেখা গেছে। কিন্তু খবরের কাগজের মারফৎ প্রত্যেকবারই প্রত্যেকটি মহাপুরুষের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি উপদেশাত্মক বাণীই মাত্র এই সব নেতৃগণের কাছ থেকে আমরা লাভ করতে পেরেছি। তা হচ্ছে 'ভো জনগণ! আপনারা এই মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করুন, তবেই সব দুঃখ ঘুচে যাবে।'

এখন কথা হচ্ছে, এঁরা তো বলেই খালাস, কিন্তু এঁদের 'ভাষণে'র মর্যাদা রক্ষা করতে হলে আমাদের কী গুরুতর সংকটে পড়তে হয় সে কথা কি কথা কেউ ভেবে দেখেছেন? জীবনে একজনকে আদর্শ বলে মেনে তাঁর জীবন অনুসরণ করে চলাই সাধনা-সাপেক্ষ। সেক্ষেত্রে একযোগে পরমহংসদেব, গান্ধীজি, বাঘা যতীন, বিদ্যাসাগর, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামমোহন, স্যার আশুতোষ, শ্রীঅরবিন্দ ও জওহরলাল নেহরু প্রমুখ সকল মহাপুরুষের আদর্শ ও জীবন অনুসরণ করা যে নিতান্ত ছেলেখেলা নয়, একথা সকলকেই মানতে হবে। কেননা, যতদূর জানা যায়, এঁদের অনেকেরই মতামত আদর্শ ও জীবনধারা বিভিন্ন, অভিন্ন নয়। ভাষণ-সুধা পানের পর জনগণের কর্তব্য কী, এবং কোন দুষ্কর তপস্যা দ্বারাই বা এতগুলি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির জীবনের আদর্শকে একীভূত করে তাকে অনুসরণ করা যায়—ভেবে দেখতে গেলে এ-সমস্যাটিও নিতান্ত সামান্য নয়।

আসল কথা এই যে, জীবনের যে-কোনো বিভাগে শীর্ষস্থানীয়

হয়ে উঠেই লোকে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে। তার আগে বক্তৃতার নাম করে হিতোপদেশ ঝাড়বার সুযোগ নিজের পরিবারের বাইরে লোকের অল্পই জোটে। কৃতী হয়ে প্রথম দু' একবার বক্তৃতায় এ-জাতীয় একঘেয়ে অর্থহীন বচন ঝাড়তে নিশ্চয় প্রত্যেকেই লজ্জিত হন। কিন্তু দু' একবার বক্তৃতা দেবার পর এ সব বক্তারা বুঝে যান যে, জনসাধারণ বলে' মস্তিষ্ক-প্রয়োগে পরাঙ্মুখ জাতির কাছে একই জাতের সব গাল ভরা কথা হাজার বার বল্লেও পুরোনো হয় না, বরং হাজার বারই করতালি পাওয়া যায়। তাই কবি কিংবা বৈজ্ঞানিক যাঁর স্মৃতিসভাতেই এঁরা যান, উদাত্তকণ্ঠে এঁরা বলে আসেন — 'এঁর জীবনধারা ও আদর্শ আপনারা অনুসরণ করুন, তবেই অন্ন-বস্ত্র-কেরসিন-কয়লা-বাড়িভাড়া-চিনি ইত্যাদি যাবতীয় সংকট মুহূর্তের মধ্যে ঘুচে যাবে।' আর আমরা চটাপট চটাপট করতালি ধ্বনিতে সভাগৃহ মুখরিত করে খিদে জন্মিয়ে বেশি দামে কেনা চালের ভাত আর দু' মুঠো বেশি খেয়ে পরমানন্দে নাক ডাকাই।

আশ্চর্য এই জনগণ! কোনো আদর্শ, কোনো চিন্তাপদ্ধতি, কোনো কর্মধারাই সে গ্রহণ করতে চায় না, অথচ সব চিন্তা, সব কাজ, সব আদর্শ সম্বন্ধেই তার অসীম কৌতূহল। কারুর কথাই সে মানতে চায় না, অথচ ভাবখানা এমন যেন সকলের কথা মানতেই তার দুরন্ত আগ্রহ। প্রত্যেকের কথাতেই সে সাময়িকভাবে বিচলিত হয়, অথচ কারুর কথাই সে এরূপভাবে গ্রহণ করে না যে, তদনুযায়ী নিজের জীবনকে গঠন করে নিতে পারে। যে-কোনো জায়গায় কালোবাজারীর কথা উচ্চারণ করলে প্রত্যেকে উষ্মায় উত্তেজিত হয়ে

ওঠে, অথচ সুযোগ পেলে প্রত্যেকটি লোক কালোবাজারের মারফৎ পয়সা রোজগারের চেষ্টা করে। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের দুঃখে এম্-এ পাশ থেকে ফোর্থ ক্লাশ পর্যন্ত সকলেই অশ্রুবিসর্জন করে, কিন্তু কেউ কখনো সাহিত্য পড়েও না, সাহিত্যের খোঁজও রাখে না বা কোনো বইও কেনে না। এরূপ এক্ষেত্রে আমাদের কাছে এক গাদা অর্থহীন গালভরা কথা আউড়ে যেতে নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিরা সংকুচিত হবেন কেন ?

আদর্শ-অনুসরণ করবার যে-সব বক্তৃতা শুনে শুনে কান ঝালা-পালা হয়ে গেল, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আজকের দিনে আমরা প্রত্যেকে বিগত দিনের জাতীয় নেতা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যাক্তিদের কেন অনুসরণ করবো, কেনই বা সেরূপ করতে আমাদের বলা হবে, তা কিছুতেই আমার বোধগম্য হতে চায় না। একে তো রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের গগনস্পর্শী প্রতিভার বিন্দুমাত্রের অধিকারী না হয়েও যে-মূর্খ তাঁদের জীবন ও কর্মধারা অনুসরণ করতে চায় সে একটি হাস্যাস্পদ গবেট্। দ্বিতীয়ত পৃথিবী, দেশ, দেশের প্রয়োজন, চিন্তা ভাবনা, সবই প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। এমনকি গত কয়েক বছরের মধ্যে এসবের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে বল্লে অত্যুক্তি হয় না। পূর্বতন শিক্ষাবিদ্, সমাজসংস্কারক, কূটনৈতিক ও বিপ্লবী নেতারা এবং অন্যান্য প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণ আজকের দিনে আবির্ভূত হলে যে নতুন বা অন্যরূপ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতেন না, তাও বলা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে মহাপুরুষ ব্যক্তিদের স্মারকসভামাত্রেই তাঁর জীবন ও আদর্শ

অনুসরণ করতে ঘন ঘন বক্তৃতা দেওয়াটা আমার কাছে অত্যন্ত ছেলে-মানুষি মনে হয়, যা আজকের দিনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মুখে আরো বেশি হাস্যকর শোনায়।

তাছাড়া এ সম্বন্ধে আরো বক্তব্য এই যে, কোনো মানুষই-এমন কি ঘন ঘন বক্তৃতাচ্ছলে হিতোপদেশদাতারাও, যখন সর্বদোষবর্জিত এবং সর্বগুণান্বিত নয়, তখন যত্র তত্র সুযোগ পেলেই হিতোপদেশামৃতের বন্যা বইয়ে লাভ কী ? বরঞ্চ মানুষের স্বভাব ও চরিত্রের যেগুলি ছোটখাট ক্রুটি সেগুলি থাকাই ভালো, তা না হলে আর মানব চরিত্রে আকর্ষণ কোথায় ? যাঁরা বক্তৃতা ঝাড়বার উপযুক্ত গণ্যমান্য ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী তাদের চরিত্রের সামান্য ক্রুটিও বহুজনের পক্ষে মারাত্মক হয়ে থাকে। অথচ, কী আশ্চর্য, তাঁরা নিজেরা দোষশূন্য না হয়েও অপরের উপর উপদেশ বর্ষণ করে বেড়ান। আর সাধারণ লোক, যাদের চারিত্রিক ছোটখাট ক্রুটিগুলি কারুই কোনো ক্ষতি করে না, অথচ ব্যক্তিত্বে বৈচিত্র্য আনে, তাদের কপালে লেখা কেবল হিতকথার নাকানি চুবানি !

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে অনেক দোষক্রুটি খুঁতটুত নিয়েই মানুষ একটি ইনটারেস্টিং জীব হয়ে দাঁড়ায়। অন্যের ক্ষতি না করে অন্যকে আঘাত না দিয়ে যে সব ছোটখাট দোষক্রুটি নিয়ে মানুষ বেঁচে থেকে সুখী হয়, সে গুলোকে যদি সে নিজের ইচ্ছেয় পুষতে চায় এবং স্বেচ্ছার ত্যাগ না করে, তবে শাস্ত্র, শস্ত্র বা রাজনীতির শাসনের দ্বারা তাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টাকে করাকে অতি নিন্দনীয় ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু মনে করতে আমি অক্ষম।

বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা আমাদের সবাইকে ভালোত্বের এক ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টায় যেরূপ উঠে পড়ে লেগেছেন এটাকে আমি একটা প্রকাণ্ড দুর্দৈব বলে মনে করি। এবং সাহিত্যিক হিসেবে, ব্যক্তিগত পছন্দ ও রুচিতে এইরূপ হস্তক্ষেপকে আমি অনধিকার চর্চা বলে মনে না করে পারি না। একেই তো আমাদের জীবন ক্ষমতাপন্ন লোকদের অসাধুতা, গৃধ্নুতা, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেচনায় জর্জরিত, তদুপরি আনন্দ আহরণের সব কটি উপকরণ একঘেয়ে ন্যক্কারজনক হিতোপদেশে পরিপূর্ণ। বেতারযন্ত্রে ভালো হওয়ার উপদেশ, গানে বড় বড় কথা দ্বারা লোকশিক্ষার ভাণ, ছায়া-চিত্রে মতবাদ ও আদর্শরূপায়ণের হাস্যকর চেষ্টায় ঝালাপালা হয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে আনা ভিন্ন আর আমাদের গত্যন্তর নেই। এ ক্ষেত্রে ছোট ছোট দোষত্রুটি শখ্-নেশা ইত্যাদি নিয়ে বেঁচে থাকাও যদি আমাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিকদের পক্ষে অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়, তবে আর জীবনে সুখ কী?

আজকাল স্থানে স্থানে মদ্যপান-বর্জন, ট্রামে-বাসে-সিনেমায় ধূমপান নিষেধ, ইত্যাদি নানারূপ নিষেধাজ্ঞার কথাই শুনতে পাচ্ছি। মদ্যপান বন্ধ হলে আমার ব্যক্তিগত কোনোই ক্ষতি নেই, একমাত্র আর্থিক ক্ষতি ছাড়া, কিছুটা ট্যাক্স বেশি দিতে হবে। সিনেমা না দেখে আমি বেশ সুখে থাকি। দেশের স্বার্থে ট্রামে বাসেও কিছু কষ্ট স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই। কাজেই ক্ষতিটা ব্যক্তিগত নয়। এইরূপভাবে যদি লোকের স্বভাব শোধরানো যেতো, তবে আমি খুশিই হতাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তা হয় না; একমাত্র

উৎকৃষ্ট জীবনের পরিবেশ তৈরি করেই উৎকৃষ্ট জীবন তৈরি করা সম্ভব। তা ছাড়া আইন করে ভালো করার চেষ্টা যে আর একটু অগ্রসর হলেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ধ্বংসকারী নিন্দনীয় একনায়কত্বে পরিণত হয়, একথা সকলেই জানেন এবং মানেন।

এই কারণেই ধর্ম মানুষকে যতই উন্নত করুক, ধর্মশাস্ত্র যে মানুষকে সংকীর্ণ ও পরমত-অসহিষ্ণু করে একথা আজ আর ব্যাখ্যা করে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কেননা ধর্মশাস্ত্র ছড়ায় আদেশ ও অনুশাসন, জোর করে সকল মানুষকে ভালোত্বের এক ছাঁচে ঢালাই করার ফতোয়া। তবু রাষ্ট্রের শাসন বা ধর্মশাস্ত্রীয় নির্দেশগুলি থেকে কোনোক্রমে গা বাঁচিয়ে চলতে পারি কিন্তু ইদানিং যে লেখকদের সবাইকে ভালোত্বের এক ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা চলেছে, সেটা একেবারেই অসহ্য। যেখানে যাই সেখানেই শুনি যে দেশের ও দশের হিতকারী লেখাই নাকি এখন থেকে লিখতে হবে — এই নাকি জনমতের নির্দেশ। বাজে কথা বলবার যে ক্রটিটি বহু কষ্টে আয়ত্ত করে বেশ সুখে আছি, সেটিও দেখছি অনেকেরই চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে। আমার সবচেয়ে গুরুতর এই দোষটুকু যদি আমার মধ্যে থেকে ছাঁটাই করে ফেলে দেওয়া যায়, তবে আর কী মোহে বেঁচে থাকবো ?

১২

বক্তৃতাময় সাহিত্য

বক্তৃতা যখন মুখ ছেড়ে লেখনীকে আশ্রয় করে সে হয় আরো মারাত্মক। সাহিত্যে বিভিন্ন চরিত্রেরা যদি এসে পাতার পর পাতা উপদেশামৃত বর্ষণ করতে শুরু করে, তা'হলে বক্তৃতা সম্বন্ধে নিস্পৃহ সাহিত্যরসাভিলাষীরা যায় কোথায়? ইদানীং সাহিত্যিকেরা অত্যধিক মাত্রায় সভাপতিত্বলোভী। সভায়-সমিতিতে সভাপতি সাজিয়ে নিয়ে গেলে তাঁরাও যে বেশ উপদেশ বর্ষণ করতে পারেন, এটাই বোধ হয় আজকাল সাহিত্যিকেরা তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করতে চান। কিংবা এমনও হ'তে পারে যে, পাতার পর পাতা বক্তৃতা না মেরে নৈর্ব্যক্তিকভাবে গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সুষ্ঠু চিত্রণে তাঁরা অপারগ। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, আজকালকার সাহিত্যিকদের বক্তৃতাপ্রবণতার মূলে উভয় কারণই বর্তমান।

তা'ছাড়া সাহিত্য যে মানুষের মনকে উন্নত করে, সামাজিক কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে এবং মানুষের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে সচেতন করে এই কথাগুলোর একটা বিকৃত অর্থ যেন সাহিত্যিক সমাজে বিস্তারলাভ করেছে। আসলে মানুষের মনকে উন্নত করবার জন্য বিশেষ মত পথ বা কর্তব্য সম্বন্ধে একগাদা বাক্যব্যয় করবার কোনই দরকার করে না। যে নীলদর্পণ-নাটক নীলকরদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে' দেশব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, এবং নীলকর

অত্যাচার দমনের কারণ স্বরূপ হয়েছিল,তাতে নীলকর বা ইংরেজের অত্যাচার সম্বন্ধে বক্তৃতা ছিল না, দেশের লোকের কী কর্তব্য সে সম্বন্ধে বাগ্‌বাহুল্য ছিল না এবং সোনার বাঙলার মলিন মূর্তি বিষয়ে উচ্ছ্বাসের ঢেউ ছিল না। ও-নাটকে শুধু কতকগুলি চরিত্র ও ঘটনার বিন্যাসের দ্বারা নীলকর-অত্যাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছিল। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকে এই নৈর্ব্যক্তিক দর্শন ও প্রদর্শনের কৃতিত্ব আরো পরিস্ফুট এবং এই কারণেই আমার মতে দীনবন্ধু মিত্র আজ পর্যন্তও আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। দুঃখের বিষয়, তৎপরবর্তী বিরাট নামজাদা বহু জনপ্রিয় নাট্যকার সম্বন্ধেই এরূপ প্রশংসা করা যায় না। কোনো ঐতিহাসিক নাটকে এই বিচিত্র দেশ সম্বন্ধে দিগ্বিজয়ী বীরের দীর্ঘ বক্তৃতার প্রয়োজন ছিল এরূপ মনে করা চলে না।

বক্তৃতা যদি আর্ট হয়, তবে তা যে নিচুস্তরের আর্ট একথা স্বীকার করতেই হবে। যত ভালো, যত মনোমুগ্ধকরই হোক, মানুষের মনের নিচের তলায় তা পৌঁছুতে পারে না, উপর তলার কয়েকটি স্থূল আবেগকে তা সাময়িকভাবে আলোড়িত করতে পারে মাত্র। এতে ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। কুশলী বক্তা যেমন লোককে দেশের জন্য প্রাণদানেও অনুপ্রেরিত করতে পারেন, তেমনি ধর্মের জন্য বিধর্মী বধেও উৎসাহিত করতে পারেন। সুরেন ব্যানার্জী কিংবা বিপিন পালের বক্তৃতা শুনে বিলেতী বস্ত্র বর্জন করা যেমন লোকের পক্ষে সম্ভব, তেমনি চেঙ্গিজ কিংবা নাদির শাহের বক্তৃতা শুনে মানুষের মাথা নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলাতেও লোকে অগ্রসর হতে

পারে। এ হোল বড় বড় বক্তৃতা-আর্টিস্টদের কথা। বাজে বক্তৃতা মানুষের উপরিচর আবেগগুলোকেও পর্যন্ত নাড়া দিতে পারে না। অবশ্য এক হিসেবে সেটা ভালোই, নইলে পৃথিবীতে বহু অনর্থ ঘটে যেতে পারতো।

অথচ যা প্রকৃত উঁচুদরের আর্ট তা মানুষের মনের গভীরতম প্রবৃত্তি, নিবিড়তম আবেগকে স্পর্শ করে। এই জন্যই আর্টের প্রভাব বিদগ্ধজনের মনে স্থায়ী হয়; তার শিক্ষা অবচেতন মনে এমনই গভীরভাবে গেঁথে যায়, যে তাকে আর তাড়ানো যায় না, এড়ানো যায় না। এই জন্যই প্রকৃত রসিককে 'রসিক সুজন' বলে অভিহিত করতে বাধা নেই।

এই কারণেই সাহিত্যের যিনি সূক্ষ্মরসের কারবারী তিনি কেবল বড় সাহিত্যিকই নন, মানব সমাজের সবচেয়ে বড় বন্ধু। এজন্য যত বেশি লোক সাহিত্য পড়ে ও উপভোগ করে, সমাজ ততই উন্নত হয়। খাঁটি সাহিত্যিকের ধর্ম মানব ধর্ম, তাঁর সমাজ মানবসমাজ। তিনি হিতোপদেশ না ঝেড়েও এই ধর্ম ও এই সমাজকে উঁচুতে তুলে দেন।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আজকাল যাঁরা নামজাদা ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক তাঁদের রচনা বক্তৃতা ও হিতোপদেশে কণ্টকিত। যেন দেশের লোককে তাঁদের নিজস্ব মতানুযায়ী ভালো করে তোলার গুরু দায়িত্ব কেউ তাঁদেরই স্কন্ধে অর্পণ করেছে। অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে বা এ জাতীয় দেশ ও জন-হিতৈষণা সম্বন্ধে একটি কথা বলবার উপায় নেই, তা'হলেই তাঁরা এবং তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা লগুড় নিয়ে

তেড়ে আসবেন। অথচ আজকালকার আমাদের জনপ্রিয় সাহিত্যিকরা যে এক একজন সাহিত্য দিক্‌পাল, এমন তো মনে হয় না। তাঁরা কেউই রবীন্দ্রনাথ কিংবা শ' নন। তাঁদের খ্যাতি, ধরুন, ইংরেজ লেখক জে বি প্রিস্টলির চেয়ে বেশি নয়। প্রিস্টলির নাম যত লোকে জানে ও যত লোকে তাঁর বই পড়ে আমাদের ইদানিংকার সাহিত্যিকরা তার একদশমাংশ পাঠকসংখ্যা আশা করতে পারেন না। খুব উঁচুদরের সাহিত্যিক যদি নাও হন, তবু প্রিস্টলি খ্যাতিমান্ — যার বেশি আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যিক সম্বন্ধেও বলা চলে না। সেই প্রিস্টলি সাহেবের বক্তৃতা প্রবণতা লক্ষ্য করে তাঁর রচনার সমালোচনা প্রসঙ্গে একটি বিলিতি কাগজে একজন সমালোচক যা লিখেছেন তা আমাদেরও প্রণিধানযোগ্য। সমালোচকটি পত্র বিশেষে লিখছেন ঃ

"Someone will have to stop Mr. Priestley from saving England and, in his spare time, the rest of the world. Never in human history has one man been so determined to save so many people against their will and on his terms and conditions."

সমালোচক সাহেব তো আর আমাদের দেশের খবর রাখেন না। নইলে জানতে পারতেন যে, দেশ এবং জগৎকে রক্ষা করবার জন্য প্রিস্টলি সাহেবের চেয়ে determined লোকও — শুধু human history নয়, বর্তমান কালেই রয়েছেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের নাম করে এ-জাতীয় মন্তব্য করা

বিপজ্জনক। তা না হ'লে দু' একখানি জনপ্রিয় উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি-সহযোগে দেখানো যেত, আমাদের সাহিত্যিকরা কত স্থূলরসের চর্চায় উৎসাহী এবং তাঁদের মন কত বাহবালোভী।

ব্যক্তিগতভাবে উদীয়মান সাহিত্যিদের প্রতি আমার অনুরোধ, সাহিত্যচর্চ্চা করতে বসে দেশ ও জগৎ উদ্ধারের গুরু দায়িত্ব যেন তাঁরা নিজ স্কন্ধে তুলে না নেন। ও কাজের জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যুগে যুগে আবির্ভূত হবেন বলে আশ্বাস দিয়ে গেছেন। সাহিত্যে যদি তাঁরা সূক্ষ্ম রস পরিবেশন করতে পারেন তা'হলেই তাঁরা মানবমনকে অনেকখানি উন্নত করতে পারবেন।

১৩

বাগ্‌বিস্তার ও বাগ্‌বিশেষ

'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর' কথাটি যে অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকুক, 'মিছা' শব্দটিকে একটু ব্যাপক অর্থেই আমি চিরকাল গ্রহণ করে এসেছি। যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে তার পক্ষে অসত্য উক্তি করার সম্ভাবনা যে বেশি তাতে আর সন্দেহ কী? কিন্তু অপর অর্থে 'মিছা' শব্দটির প্রয়োগও এক্ষেত্রে সার্থক।

যে অনেক কথা বলে, 'মিছা' বা অনর্থক বাক্‌প্রয়োগ না করা তার পক্ষে অসম্ভব। কথার অপব্যবহার সে না করেই পারে না। বেশি কথা বলা মানেই বাজে কথা বলা। বস্তুত, বাচালতা ও বাতুলতার মধ্যে কোথাও একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে। বাচাল ব্যক্তিমাত্রই বাতুল না হলেও, বাতুলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাচালতাতেই নিজেকে প্রকট করে। এ কারণে বহুভাষী ব্যক্তিদের আমি সাধারণত এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করি।

সাহিত্য-শিল্প-ললিতকলা সম্বন্ধেও ওইরূপই আমার মনোভাব। যাবতীয় শিল্পে ও ললিতকলায় বেশি বলা, বেশি বিদ্যা বা কৃতিত্ব জাহির করা কিম্বা অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশের ফল সুখকর হয় না এরূপই দেখেছি।

ধরুন সঙ্গীতশিল্প। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বহু মহারথীই আছেন যাঁদের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য বিশেষ নেই। কিন্তু তবু দেখা যায়

এঁদের মধ্যে কেউ গান শুরু করলেই আসর হাল্কা হয়ে আসে, আবার কেউ তানপুরোয় পিড়িং পিড়িং আওয়াজ করতে না করতে উদ্‌গ্রীব শ্রোতার ভিড়ে আসর সরগরম হয়। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের কারণ, আমার মনে হয়, একেকজন গায়ক যে ক্ষেত্রে রাগরাগিণী সম্বন্ধে তাঁর যত কিছু বিদ্যা আছে সবই দেখাবার জন্য বদ্ধপরিকর, অন্য গায়ক সে ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গীতে সেইটুকু বিস্তার, সেইটুকু অলংকরণ, সেইটুকু কারুকার্য করেই সন্তুষ্ট থাকেন, যেটুকু তাঁর শ্রোতারা উপভোগের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে এবং যা তাঁর শিল্পকে ভারাক্রান্ত করবে না।

চিত্রশিল্পের বেলাতেও ঐরূপ অতিশয়োক্তি বা অতিঅঙ্কন অনেক সময়ই সুখকর হয় না বলেই জানি এবং অভিনয় নৃত্য ইত্যাদিও অতিঅলংকরণ দোষে দুষ্ট না হলেই ভালো লাগে।

আমি সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট লোক, সাহিত্যের কথাই বলি। বেশি বলার ঝোঁক সাহিত্যরসকে যে অনেক সময় ক্ষুণ্ণ করে একথা চিরকালই অনুভব করে এসেছি। তার মানে এ নয় যে, সুবৃহৎ উপন্যাস বা মহাকাব্যের বিরুদ্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। খুব বড় উপন্যাসও অবান্তর বাজে কথা বর্জন করে, না ফেনিয়ে লেখা যেতে পারে। মহাকাব্যও তাই। কিন্তু সাহিত্যিক যদি তাঁর বক্তব্য পাঠক-দের মগজে 'গজাল ঝেড়ে গোঁজাতে' চান, এক কথাকেই ফেনিয়ে ফেনিয়ে লক্ষ কথায় পরিবর্তিত করেন, তবে ফল বড়ই অস্বস্তিকর হয় — যে অস্বস্তিকে ইংরেজীতে বলা হয় boring। অতিঅলংকরণেই যে রূপ খোলে না তা নারীসৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যেমন স্বয়ম্প্রকাশ কাব্যের

বেলাতেও তাই। তা যদি না হোত তাহলে নিশ্চয়ই নলোদয় মেঘদূতের চাইতে বড় কাব্য বলে গণ্য হোত।

এরূপই সচরাচর দেখা যায় যে, পরীক্ষায় যে সব ছেলে ফেল করে, তারা তিন খাতা উত্তর লিখে আসে, আর যারা প্রথম দ্বিতীয় হয় তাদের উত্তরে এক খাতাও ভর্তি হয় না। পরীক্ষকেরা চান যে ছাত্ররা 'টু দি পয়েণ্ট' উত্তর দেবে। সাহিত্যেরও যদি ইস্কুল কিম্বা পরীক্ষা থাকতো তা হলে পরীক্ষক নিশ্চয়ই টু দি পয়েণ্ট রচনাতেই বেশি নম্বর দিতেন। এবং মহাকালও সেভাবেই রচনার মূল্য নিরূপণ করেন বলে মনে করি।

অবশ্য আমি উচ্চ সাহিত্যের কথাই বলছি, আমরা যে-সব 'ধানাই পানাই' লিখি তার সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করলে আমাদের প্রতি অবিচার করা হবে। এ-সব রচনা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে লেখা হয় না, বাগ্‌বিস্তারই এ জাতীয় রচনার মূলধন। কিন্তু গল্প উপন্যাস বা কবিতা, যার সার্থকতা ও ব্যর্থতাতেই সাহিত্যের চড়াই-উৎরাই গড়ে ওঠে, সে সব রচনার পক্ষে অযথা বাগ্‌বিন্যাস সম্বন্ধে খুবই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সম্প্রতি বাঙলায় যে-সব গল্প উপন্যাস রচিত হচ্ছে, তাদের অধিকাংশের মধ্যেই এ জাতীয় নিরর্থ বাগ্‌বিন্যাসের প্রবৃত্তি ইদানিং বড়ই পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। এমন হয়েছে যে সাম্প্রতিক গল্প উপন্যাস পাঠের দ্বারা নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখার প্রচেষ্টা আমার পক্ষে এক ক্লেশকর ব্যায়াম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসই একটুখানি পড়ে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। নিরর্থক বাক্যের

জালে মন বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে, রচনার কোনো কেন্দ্রসূত্র খুঁজে না পেয়ে বিমুখ মনকে অগত্যা সাহিত্য-পাঠ থেকে নিরস্ত করতে হয়। বস্তুত ইদানীন্তন সাহিত্যের একটা বৃহৎ অংশ পড়ে একথা মনে না হয়ে পারে না যে, আজকের অনেক সাহিত্যিকই তাঁদের মনকে কোনো কিছুতে নিবিষ্ট করতে পারছেন না। মনটা যেন সততসঞ্চরমান জলধরপটলের ন্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। জোর করে, দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে কোন কথাই আজ আর তাঁদের বলবার নেই বলেই যেন বহু অবান্তর, একঘেয়ে, নিরর্থক বাক্যজালের আড়ালে তাঁরা সেই নিঃসম্বলতাকে গোপন করতে চাইছেন।

সাহিত্যিকেরা আমাদের শ্রদ্ধেয় ও অন্তরঙ্গ, ভগবান বা করুন তাঁদের সম্বন্ধে কোনো অন্যায় উক্তি যেন না করি। আর, আজকালকার সব রচনাই যে ওরূপ অন্তঃসারশূন্য বাগ্‌বিস্তারে ভরা একথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করবেন যে, আজকালকার অনেক জনপ্রিয় সাহিত্যিকের মধ্যেই বিস্তর কথা বলবার প্রবৃত্তিটা যেন বড়ই প্রবল। কিছুই বক্তব্য নেই, কিন্তু তবুও অনেক কথা বলবার লোভ যেন তাঁদের দুর্নিবার। এ জাতীয় রচনাকে সাময়িকভাবে তারিফ করবার মত লোকেরও হয়তো অভাব নেই। তবু আমার মনে হয়, সাহিত্য রচনায় কিয়ৎ-পরিমাণে বাক্‌সংযম অভ্যাস করলে সাহিত্যের কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

১৪

লেখার দাম

সম্প্রতি কয়েকটি যুবক তাঁদের হাতে লেখা পত্রিকাটিকে ছেপে বার করবার উদ্দেশ্যে সাহায্য ও পরামর্শের জন্য আমার কাছে এসেছিলেন। আমি এই উদ্যোগে তাঁদের যথেষ্ট নিরুৎসাহিত করতে চেষ্টা করলাম। বল্লাম যে, অকারণে কতকগুলো পয়সা খরচ হবে। ছাপা বাঁধাই, কাগজ ইত্যাদি দুর্মূল্য, উপরন্তু নগদ দাম ভিন্ন পাবার আশা নেই। আনুষঙ্গিক খরচ হিসেবে মুটে ভাড়া, ট্রাম ভাড়া আছে, কাগজ পাঠাবার ষ্ট্যাম্প খরচ আছে। অথচ আজকালকার বাজার এমন নয়, যে এ-জাতীয় পত্রিকা বিক্রি করে খরচের শতাংশও তুলে আনতে পারবার আশা আছে। আমার যুক্তির উত্তরে যুবকবৃন্দ জানালেন যে, কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদির প্রয়োজনীয় খরচ তাঁরা করতে প্রস্তুত আছেন, তা ছাড়া তাঁদের কাগজে তো শুধু তাঁদের লেখা থাকবে না, থাকবে বাঙলা দেশের বহু দিক্‌পাল সাহিত্যিকের রচনা। কাজেই পত্রিকাটি বিক্রি না হবার কারণ নেই। উদার হৃদয় বঙ্গীয় লেখকগণ নাকি বিনামূল্যে তাঁদের লেখা দিয়ে এই কাগজটিকে সমৃদ্ধ করতে অতিমাত্রায় উৎসুক বলে জানিয়েছেন। অতএব ভাবনা কী ?

পূর্বকালে দিগ্বিজয়ী রাজারা ব্রাহ্মণকে পুরোধা করে অগ্রসর হতেন। এই তরুণগণও সেইরূপ প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকদের অগ্রবর্ত্তী

করে খ্যাতির পথে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক। ক্রমাগত লেখা ফেরত পেয়ে পেয়ে, এই তরুণেরা সম্ভবত উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁদের রচনায় কোনো সম্পাদক, সাহিত্যিক বা সাহিত্য-রসিক বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে নামজাদা সাহিত্যিক-রূপী পুরোহিতদের অগ্রবর্তী করে আত্মপ্রকাশ করলে দু'একজন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু কালচক্রে এমনই অবস্থা বিপর্যয় ঘটেছে যে, যেক্ষেত্রে সে কালে পুরোহিতেরা বহু স্বর্ণ, অসংখ্য ধেনু, নিষ্কর ভূখণ্ড ইত্যাদি লোভনীয় পরিতোষিক লাভ করতেন, সেক্ষেত্রে ইদানিংকার প্রতিযোগিতার বাজারে বিনামূল্যে 'আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান' তারি জন্য ঠেলাঠেলি করে খ্যাতিমান্ সাহিত্যিক পুরোহিতেরা এগিয়ে আসছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের কাজে না লাগানোই মূর্খতা।

সাহিত্য-যশোলোভী তরুণগণ এবং বঙ্গদেশীয় সম্পাদক ও প্রকাশকেরা যাই মনে করুন না কেন, লেখকদের পক্ষে বিনামূল্যে রচনা বিতরণের এই আগ্রহকে আমি আত্মতহ্যা বা নিজ সমাজের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত ভিন্ন আর কিছু বলেই আমি ভাবতে পারি না।

আজকের দিনে কুঁড়িধরা সাহিত্যিক, সাহিত্যিকম্মন্য পণ্ডিত, বি-এ পাশ, এম-এ পাশ, চাকুরে, ব্যবসায়ী, পত্রিকার মালিক ও পুস্তক প্রকাশক সকলেই যে সাহিত্যিকবৃন্দকে নিতান্ত অবজ্ঞা ও অনুকম্পার চোখে দেখে থাকে, তার কারণ আমার মনে হয়, সাহিত্যিকদের এই পরম উদার, পরম কারুণিক মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। সাহিত্যিকদের যে কোনোই দাম নেই, লেখা জিনিসটার

যে কোনোই মূল্য নেই, লেখার কাজটা পরিশ্রম সাপেক্ষ হলেও সেটা যে একটা কাজের মধ্যেই ধর্তব্য নয়, একথা মেনে নিতে, এমন কি এ ধারণা অপরের মনে ঢুকিয়ে দিতে, সাহিত্যিকরা নিজেরাই দেখি সর্বদা প্রস্তুত। নইলে কী কারণে খ্যাতিমান্ সাহিত্যিকেরা এ জাতীয় এবং আরো অসংখ্য নানা জাতীয় কাগজে লেখার ঝুলি নিয়ে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন? যারা কাগজ-ওয়ালাকে, ছাপাখানাকে, দপ্তরীকে, এমন কি মুটেকে পর্যন্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত, অথচ লেখার মূল্য আছে একথা স্বীকার করতে নারাজ, তাদের অনুরোধে বা অনুনয়ে লেখকরা বিগলিত হয়ে নিজেদের আত্মসম্মান বিসর্জন দেন কীরূপে? শুনতে পাই বড় বড় কাগজে লেখা দেবার জন্য নামজাদা লেখকদের মধ্যে নাকি বিরাট প্রতি-যোগিতা চলে। অথচ সে-সব পত্রিকা মূল্য দেয় সবচেয়ে কম এবং সবচেয়ে দেরিতে। একজন 'নাম'-করা সাহিত্যিকের নিজের মুখে শুনেছি যে, কোনো একটি তথাকথিত 'প্রথম শ্রেণীর' মাসিক কাগজে তিনি গদ্যে-পদ্যে নানারূপ লেখা নিয়মিতভাবে লিখে যান, আর সেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ছ'মাস আটমাস পরে তাঁর রচনার মূল্য হিসেবে কখনো তিরিশ, কখনো বা চল্লিশ টাকা পাঠিয়ে তাঁকে কৃতার্থ করেন। ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখবার দুর্বল মনোবৃত্তি থেকে লেখকেরা তাঁদের দুর্দশা নিজেরাই সৃষ্টি করেন। সেইজন্যই আজকের বড় বড় পত্রিকা লেখকদের রচনার মূল্য দেওয়া বাজে খরচ বলে' বলে মনে করে এবং তাদের 'বাজেটে' লেখার দামের অঙ্কটা এতই কম বলে ধরা হয়, যা তাঁদের মুটে খরচকে ছুঁতে পারে

কিনা সন্দেহ। বড় বড় কাগজের পূজো সংখ্যার জন্য নাকি 'বড় বড়' সাহিত্যিকদের কাছ থেকে অযাচিতভাবে এত লেখা আসে যে, সব ছাপতে না পেরে সম্পাদকেরা বিব্রত হয়ে পড়েন। এবং বেতার-কেন্দ্রে সাহিত্যের জন্য যে অতি সংকীর্ণ স্থান আছে, সেখানে সামান্য একটু ঠাঁই পাবার জন্য খুব বড় থেকে মাঝারি ছোট নগণ্য সাহিত্যিক-দের পর্য্যন্ত প্রায় সবাইকেই নাকি কিউ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

হায় সাহিত্যিক! তোমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথা ঘামিয়ে প্রাণপণ যত্নে পাতার পর পাতা ভরাট করবার পরিশ্রমের কোনো মূল্যই যদি তুমি নিজে না দাও, নিজে না বোঝ, তবে কী করে তুমি আশা করতে পারো যে, অপরে তোমার তুর্লভ শক্তি, অসাধারণ কাজের বিন্দুমাত্র মূল্য দেবে? লেখা ছাপাবার এই দীন আত্মঘাতী মনোবৃত্তি সমস্ত সাহিত্যিক সমাজকে যে পিষে মেরে ফেলছে তাও কি তুমি বোঝ না?

আমি কত সাহিত্যিককে বলে দেখেছি, এরকম করবেন না। যারা মুটের ভাড়াও সাহিত্যিককে দিতে প্রস্তুত নয়, সমস্ত সাহিত্যিক প্রতিজ্ঞা করুন তারা যেন একটাও লেখা না পায়, শাদা কাগজ বেঁধে কিংবা যা-তা ছেপেই যেন তারা কাগজ বার করতে বাধ্য হয়। রচনার গুণানুসারে উপযুক্ত মূল্য না দিয়ে বড় কিংবা ছোট কোনো কাগজই যেন একটি লেখাও সংগ্রহ করতে না পারে। কিন্তু সাহিত্যি-কেরা এতই হ্যাংলা, নিজের রচনা ছাপার অক্ষরে দেখবার আগ্রহ তাঁদের এমনই অপরিসীম যে, নতুন নতুন কাগজ বার করে যারা

পয়সার অপব্যয় করতেই প্রস্তুত, তাদের অনুরোধে পর্যন্ত তাঁরা বিনামূল্যে লেখার তাড়া নিয়ে এগিয়ে আসেন।

সাহিত্যিকেরা কেন একযোগে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেন না সেটাও আমার বুদ্ধির অগম্য! হতে পারে যে, মতামতের বৈষম্যে কিংবা প্রত্যেকেরই আত্মশ্রেষ্ঠত্বের হাস্যকর দম্ভের পারস্পরিক আঘাতে সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে মুখ দেখাদেখি বন্ধ, কিংবা তাঁদের মধ্যে মারামারি লেগেই থাকে। তবুও তো তাঁরা একই সংকীর্ণ সমাজের, একই অবজ্ঞাত সম্প্রদায়ের লোক। যুধিষ্ঠির যেমন বলেছিলেন যে, আমরা পাঁচভাই একশ ভাইয়ের সঙ্গে যতই ঝগড়া করি বহিঃশত্রু আক্রমণের সময় আমরা একশ পাঁচ ভাই এক দলে, তেমনি মনোবৃত্তি নিয়ে, নিজেদের স্বার্থে, সকল সাহিত্যিক মিলে আত্মরক্ষার একই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া কি সাহিত্যিকদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব?

১৫

সাহিত্য-সৃষ্টির পরিবেশ

ইদানিং দেখছি জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আমাদের মত নিরীহ মূর্খদের ঠকাবার জন্য অনেকেই ওৎ পেতে বসে আছে। আমরা সাধারণ লোকেরা পদে পদেই নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত হচ্ছি। জীবনের যেটুকু সাংসারিক, জৈবিক ও সামাজিক অংশ সেটুকু থেকে যতই মন্থন করা হোক অমৃত আর উঠতে চায় না, বিষটাই উঠছে বেশি। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সাহিত্য ও শিল্পের জগতে বায়ু পরিবর্তন করে এসে জীবনটাকে একটু চাঙ্গা করে নেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। সেখানে অন্তত একটু মুক্তির হাওয়া আছে।

জাগতিক বিচারে আজকালকার দিনে যাঁরা 'সাকসেস্' আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছেন, অর্থাৎ পয়সা করতে পেরেছেন, তাঁদের প্রায় সকলকেই একই পথ ধরে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে হয়েছে। সে পথ হচ্ছে মিথ্যাচারের পথ। অর্থাৎ মুখে ও বাইরে সর্বদাই রামরাজ্য, গান্ধীবাদ, লোকসেবা, গো-সেবা, ধর্মপ্রবণতা, সততা ও পুণ্যকর্মের বুলি আউড়ে, চালে কাঁকর, আটাতে তেঁতুলবীচি, ঘিয়ে বনস্পতি ও চর্বি, তেলে শেয়ালকাঁটা, মাখনে ভেসেলিন, দামি ওষুধের খালি শিশিতে যাহোক কিছু দিয়ে পয়সা উপায় করা। এ সব ছাড়াও পয়সা উপার্জনের অ-রামরাজ্যোচিত অনেক পথ আছে, তার কোনো পথেই ভিড় কিছু কম নয়। মূলমন্ত্র হচ্ছে, যে জিনিসেরই চাহিদা আছে,

তাতেই ভেজাল মেশানো। এ হচ্ছে অর্থোপার্জনের রাজপথ। ব্যবসাদাররা এ সব করেন, আর এই ব্যবসাদারদের প্রসাদলোভী সরকারী বেসরকারী অধিকাংশ লোক রজতমূল্যের বিনিময়ে এঁদের সাহায্য করবার আগ্রহে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকেন।

এইরূপ বিষাক্ত পরিবেশে, হৃদয়হীন ঠগ, জোচ্চোর, ডাকাত ইত্যাদি পরিবৃত হয়ে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হোত যদি না একটা সুন্দরতর, সুস্থ, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের স্বপ্ন ও আশা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বেঁচে থাকতো। এই আশা ও স্বপ্নকে ধরে রাখতে পারে অথবা আশার অবলম্বন-স্বরূপ হতে পারে, দুঃখের বিষয় জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই এরূপ কোনো জোরালো আশ্রয় নেই। এ কারণে সাহিত্য শিল্পের সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে নিজের মনকে ডুবিয়ে দিয়ে জীবনের সর্বব্যাপী তিক্ততাকে মাঝে মাঝে ধুয়ে না ফেললে 'মরবিড' কিংবা 'সিনিক' হয়ে যাওয়া ভিন্ন আর উপায় থাকে না।

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, হিংসা, হতাশা ও বিকৃতবুদ্ধি প্রভৃতি সমাজক্ষয়কারী প্রবৃত্তি ও আবেগের নিষ্ঠুর কবল থেকে মনকে বাঁচাতে হলে সাহিত্য ও শিল্পকলার দিকে তাকে আকৃষ্ট করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সমসাময়িক সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে পরিচ্ছন্ন, রুচিসম্পন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত, আশাবাদী রচনায় উদ্বুদ্ধ করা। বলাই বাহুল্য, এজন্য সাহিত্যিকদেরকে নিদারুণ অভাব থেকে অন্তত আংশিক মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য একথাও যে, সাহিত্যিক যতই খ্যাতনামা হোন, নিজের দেশের ও বিদেশের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দরকার।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের যাঁরা নামজাদা সাহিত্যিক, নাম করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের মধ্যে অনেকে লেখাপড়ার শেষাংশ পরিত্যাগ করেছেন দেখে বড় খারাপ লাগে। আমি নিজে যে কজন নামজাদা সাহিত্যিককে চিনি, তাঁদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তরজনই বিদেশী সাহিত্য দূরের কথা সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে পর্যন্ত বিন্দুমাত্র যোগাযোগ রাখেন না। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এঁরাই বেশি জনপ্রিয়, এঁদেরই রচনার চাহিদা এবং বইয়ের কাটতি বেশি। তার কারণ আমার মনে হয়, এঁদের মন কখনই নতুন নতুন চিন্তা ও ভাবের অনুপ্রবেশে আলোড়িত হয় না বলে সহজ, বক্তব্যহীন, উচ্ছ্বাসপূর্ণ, সাধারণ স্তরের লেখা এঁরা সহজে লিখতে পারেন। এরূপ লেখা অধিকাংশ পাঠক ও পাঠিকার মস্তিকের উপযোগী ও নিশ্চিন্ত কালহরণের উপযুক্ত অবলম্বন বলে এদের লেখা সহজেই প্রশংসা পায় এবং অল্পদিনেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সাহিত্যিকের এই মানসিক আলস্য ও কর্মবিমুখতা সম্ভবত জীবনের বহুক্ষেত্রব্যাপী তিক্ততার ফল। বস্তুত যতদিন রাষ্ট্রপরিচালনা সুশৃঙ্খল, সুনিয়মিত, কল্যাণকর এবং আনন্দ ও শান্তির সহায়ক না হবে, ততদিন আমাদের অভাবগ্রস্ত সংগ্রামক্লান্ত শিল্পস্রষ্টাদের মনের গতি অসুস্থতা ও বিকৃত চিন্তা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এইখানেই হচ্ছে রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পের আসল সম্পর্ক। রাজনীতি ও সমাজনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাহিত্য অথবা শিল্পকে নিয়োগ করবার কোনোই প্রয়োজন হয়

না, যদি রাজনীতির সুপ্রয়োগ ও সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধি ও শান্তির পথে নিয়ে যাওয়া যায়। সাহিত্যিক ও শিল্পস্রষ্টাদের মস্তিষ্ক সাধারণ স্তর থেকে এতই উঁচুদরের যে মাস্টারী কিংবা বক্তৃতা না করেও তাঁরা নতুন নতুন চিন্তার আলোকে অগ্রসরমান মানব-সমাজকে পথ দেখাতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যিককে এইরূপ কল্যাণকর রচনার অবকাশ দেবার জন্য ও নব নব ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য চাই এমন একটি পরিবেশ যেখানে অসৎ লোকেরা পদে পদেই জীবনকে আঘাত করতে সমর্থ নয়। মহাভারতোক্ত ভীষ্মের উপদেশ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রধর্ম-ব্যাখ্যার মূল বক্তব্য হচ্ছে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। ও কাজ যদি উপযুক্তরূপে অনুসৃত হয় তবে সাহিত্যকে রাজনীতির কাজে লাগাবার প্রয়োজন হয় না। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের আদর্শ সর্বদাই জনকল্যাণের সহায়ক। প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবনযাত্রায় ব্যাহত হয়ে বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে সে আদর্শে অবিচলিত থাকা অনেক সাহিত্যিকের পক্ষেই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি না উচ্চ সাহিত্যের আদর্শ সর্বদা চোখের সম্মুখে রাখা যায়। কিন্তু সে কাজ একেবারেই সহজ নয়।

উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার ক্ষমতাই যে শুধু জগতে দুর্লভ তা নয়, তার প্রেরণাও লেখকের মনোগতি এবং পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষ এবং সেহেতু অপেক্ষাকৃত বিরল। পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক, যে কোনো কারণে মন যদি তার শান্তি, স্থৈর্য ও তুলা (balance) হারিয়ে ফেলে তবে সাহিত্যিকের পক্ষে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করা

দুরূহ। পরিবেশ যখন পীড়াদায়ক ও অস্বস্তিকর এবং মন যখন বিরক্ত, বিচলিত ও বিভ্রান্ত, তখন সাহিত্যিক কোনো উঁচুদরের রচনার বিষয় বা প্রেরণা খুঁজে পাবেন এরূপ আশা করাই বাতুলতা মাত্র। এ কারণে বর্তমানে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে তেমন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না এটা বিস্ময়কর নয়, এবং এজন্য সাহিত্যিকদের প্রতি কোনো নিন্দা বা দোষারোপ করাও অসঙ্গত।

এরকম প্রশ্ন কেউ তুলতে পারেন যে, আলোড়ন, বিপ্লব কিংবা সংগ্রামের মধ্যেও কি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়না? সেইরূপ পারিপার্শ্বিকেও কি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হওয়া সম্ভব নয়? সম্ভব, মানি। কিন্তু পারিপার্শ্বিক জগৎ যতই আলোড়িত আন্দোলিত হোক সে আলোড়ন যদি মনকে আশার দিকে নিয়ে যায়, নতুন জগতের সম্ভাবনার অভিমুখী করে, তবেই সাহিত্যিকের মন সেই অশান্তি ও আলোড়ন পেরিয়ে অগ্রসর হবার প্রেরণা পায়, নচেৎ নয়। যে পারিপার্শ্বিক মনকে হতাশার গ্লানি, ব্যর্থতার হীনতা অথবা মানব-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ করে, তা থেকে কোনো বিষয়ই খুঁজে পাওয়া যায় না, কোনো প্রেরণার দেবীই সে অশুচি পরিবেশে আবির্ভূত হন না।

১৬

সম্রাটের সভা

সম্প্রতি জনৈক লেখক একজন প্রাচীন কবির রচনা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে এক উপাধিধারীকে বড়ই বিচলিত করেছেন। আমাদের দেশের কোনো 'মহাকবি' কোনো সমালোচকের দ্বারা বিন্দুমাত্রও নিন্দিত হবেন, এটা আমাদের দেশের অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকের পক্ষেই অসহ্য।

সৌভাগ্যের বিষয়, রৈবত-কে উচ্চ ডিগ্রিধারী সাহিত্যের অধ্যাপক অথবা সাহিত্যসমালোচক হতে হয়নি। প্রথমোক্তরা সাহিত্যের দেহ-ব্যবচ্ছেদে পটু, আবার তার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গূঢ় অর্থো-দ্ধারেও তাঁদের সমতুল নেই। ছাত্রপাঠ্য কাব্য-সাহিত্যের বাহির-ভিতর, শরীর-আত্মা, সহজ অর্থ ও গূঢ় তাৎপর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যত সাহিত্যিক ও সমালোচক যা কিছু বলে বা লিখে গেছেন, সে-সব সম্বন্ধেই তাঁরা ওয়াকিবহাল। সাহিত্যের বিষয়ে তাঁদের দু'টি মাত্র সামান্য দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত যতক্ষণ না কোনো গ্রন্থ বা কোনো লেখকের রচনা ছাত্রদের পঠনীয়রূপে স্বীকৃত কিংবা গৃহীত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সাহিত্যের বোদ্ধা ও বোধকর্তা অধিকাংশ সাহিত্যা-ধ্যাপকই জানেন না, সে গ্রন্থ বা রচনার গুণাগুণ কী। তার কারণ, কেবলমাত্র বিদ্যার দ্বারা সাহিত্যের মর্ম বুঝতে বা বিচার করতে হলে Second hand বা হস্তান্তরিত ব্যাখ্যার সাহায্য না নিয়ে উপায়

নেই। কাজেই যতক্ষণ কোনো খ্যাতনামা সমালোচক কোনো নতুন অথবা পুরাতন লেখক ও তাঁর রচনা সম্বন্ধে সপ্রশংস আলোচনা না করেন, ততক্ষণ এই পণ্ডিত ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে অনেকেই খোঁজ রাখেন না, কে ভালো লিখেছে বা আর কেই বা অসাধারণ রকম ভালো লিখেছে।

এই শ্রেণীর বিদ্বান্ ব্যক্তিদের আরো একটি দুর্বলতা এই যে, তাঁরা সাহিত্যের ইতিহাস বা সাহিত্য-সমালোচকগণের রচনা থেকে যে-সব তথ্য, তত্ত্ব ও মত সংগ্রহ করে' একবার পরিপাক করেন, তা আর তাঁরা জীবনে ত্যাগ করেন না। দান করে করে বিদ্যা বেড়ে যায় কিনা জানি না, কিন্তু তা যে বেশ মজবুত ও অনড় হয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কয়েকবার অধীত, এবং অসংখ্যবার উচ্চারিত বিদ্যা কেবল মুখস্থ নয়, এমনভাবে অন্তরস্থ হয়ে যায় যে তাতে কোনো অদল-বদল করা বেজায় কষ্টসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

তা যদি না হবে, তা'হলে প্রাচীন লেখকমাত্রেরই সম্বন্ধে আমাদের দেশের ডিগ্রিধারীরা এরূপ নির্বিচারে উচ্ছ্বসিত হন কেন? একমাত্র কারণ এই মনে হয় যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যে অধিকাংশই নিজেরা রসগ্রহণ বা সাহিত্যবোধ ক্ষমতার ব্যবহারে অপারগ বা অনিচ্ছুক। দুঃখের বিষয় আমাদের সাহিত্যের এমন খুব কম সমালোচনাই প্রকাশিত হয়েছে, যা 'আহা' এবং 'ওহো' সংযুক্ত উদ্ধৃতি ছাড়া প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্যের নিছক সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণে অগ্রসর। এক্ষেত্রে ডিগ্রিধারীরা অসহায় ও নিরুপায় হয়ে 'আহা' এবং 'ওহো' কে অবলম্বন করেই বিদ্যের জাহাজ ভাসাবেন এতে

আর আশ্চর্য কী ? সঠিক বা সঙ্গত বিচার যখন দুর্লভ তখন নামদাজা বা নাম শোনা আছে এইরূপ লেখকদের সম্বন্ধে নির্বিচারে ভক্তিতে গদগদ হওয়াই নিরাপদ। নইলে, কী আশ্চর্য, সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধে কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে মাইকেল, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীন সেন পার হয়ে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত সকলেই মহাকবি কেন ? কী দুর্দৈব যে চণ্ডীদাস ও মাইকেলের সঙ্গে বিশেষণের সমতার দরুণ, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র এক শ্রেণীতে আসন পাচ্ছেন। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সাহিত্যরসিক ও সাহিত্য-সমালোচকেরা নিজেদের সাহিত্যে উৎকৃষ্ট, মাঝারি ও নিকৃষ্ট সাহিত্যিকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু জগদ্বিখ্যাত মোরা কাব্যপ্রাণ জাতি (কবিগুরুর কাছে মার্জনা চাই), তাই আমাদের কবিরা সকলেই শুধু ভালো কবি নন, নির্বিচারে মহাকবি। কী ভাগ্য, রবীন্দ্রনাথকে আজো মহাকবি বিশেষণ দিয়ে কেউ এঁদের সকলের দলে ভিড়িয়ে দেয়নি। কী ভাগ্য রবীন্দ্রনাথ কবিমাত্র হয়েই আমাদের মনের সবচেয়ে বড় আসন জুড়ে আছেন।

আমাদের দেশে এত ভালো সাহিত্য হোল, এত বড় সাহিত্যিক ঐতিহ্য আমাদের। কাব্যে, গল্প-উপন্যাসে, ভ্রমণ কাহিনীতে, গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্য এত সমৃদ্ধ। তবু এ-সাহিত্যে কি কোনো-দিন প্রকৃত সমালোচনা-সাহিত্য গড়ে উঠবে না ? কোনোদিন কি আমাদের রসজ্ঞ পণ্ডিতেরা সাহিত্যের রস-বিচারে অগ্রসর হবেন না ? কেবল কি 'আহামরি'র বদহজম উদ্গার করেই লেখকেরা সাহিত্য-সমালোচকের খ্যাতি অর্জন করবে ? হবুচন্দ্রের রাজ্যে কেবল

'স্বপ্ন শুধু সত্যমাত্র' নয়, সেখানে মুড়ি-মিছরির সমান দর হয় বলেও গল্পে পড়া আছে। আমাদের সাহিত্যিক রাজ্যে সেই হবুচন্দ্রের রাজগী কবে শেষ হবে ?

বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় তিনপ্রকার রীতি প্রচলিত দেখতে পাই। এক, কোনো সাহিত্যিককে একজন বিলিতি লেখকের নামে বিশেষিত করে সংক্ষেপে কাজ সারা। যেমন, বাঙলার স্কট, বাঙলার মিল্টন, বাঙলার উইল্কি কলিন্স। দ্বিতীয়, (এটা সাধারণত সাহিত্যিকরা মরে যাবার পরই হয়), লেখকের রচনাবলীর কিছুমাত্র না পড়ে এবং না বুঝে মহাকবি, যুগপ্রবর্তক লেখক, জাতীয় ঐশ্বর্য ইত্যাদি বিশেষণে লেখককে ভূষিত করা। তৃতীয়, কোনো গ্রন্থকারের রচনার আলোচনা করতে বসে তাঁর রচনার থেকে অগুনতি উদ্ধৃতি দিয়ে প্রত্যেক উদ্ধৃতির নিচে 'আহা কী অপরূপ', 'অহো কী অপূর্ব', 'মরি মরি, কী প্রাণ-মাতানো' ইত্যাদি উচ্ছ্বাসে পাতা-ভরানো। তাছাড়া সাহিত্যিকরা কিছুটা খ্যাতি অর্জন করার পরই কেউ সাহিত্য-সম্রাট, কেউ মহাকবি, কেউ সাহিত্য-দিকপাল হন। কেউ সূর্য, কেউ বা ইন্দ্র। কালক্রমে কেউ বিধাতাপুরুষ হয়ে দাঁড়ালেও আশ্চর্য হবার নেই।

তাই, যদি বলা যায়, আমাদের দেশের কোনো প্রাচীন কবির রচনা সুললিত ও শ্রুতিমধুর হয়েও অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য বলে গণ্য হতে পারে না, তাহলে উপাধিধারী ও উপাধিধারিণীরা ছুটে আসবেন কড়া প্রতিবাদের লগুড় নিয়ে। আর তাই শুনে আমাদের জনসাধারণ — যারা কাব্য কিছুই বোঝে না, এবং কাব্য সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলও

পোষণ করে না — তারাও মারমুখো হয়ে বলবে 'কী আমাদের মহা-কবির অপমান!'

এই অপরূপ পরিবেশেও আমাদের সাহিত্যিকদের লিখতে হয় — লিখে যেতে হয় আরো ভালো করে — শুধুমাত্র নিজের আদর্শ আর মহাকালের দিকে তাকিয়ে। সে জানে, যতদিন দৈববলে সে খ্যাতিমান্ না হতে পারবে ততদিন তার রচনা সম্বন্ধে কী বিদ্বান্ সমাজ, কী সধারণ পাঠক. কেউই ঔৎসুক্য দেখাবে না। তার রচনার কোনো বিচারই হবে না ততদিন।

কিন্তু যদি ভাগ্যক্রমে সে একবার 'নাম' করে ফেলতে পারে, তখন যত অপকৃষ্ট লেখাই সে লিখুক, মাসিক পত্রিকার সমালোচক থেকে আপামর-সাধারণ সকলেই সে লেখা পড়ে বলবে — 'আহা মরি, কী লেখাই লিখেছে!'

১৭

আমাদের মাসিক পত্র

ইদানীং সাময়িক পত্র, বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত নতুন মাসিক পত্রিকা খুললেই দেখা যায়, তাতে অন্যান্য সমসাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাগুলির পিণ্ডি চটকাবার জন্য একটি বিশেষ বিভাগের ব্যবস্থা আছে। অপর পত্রাদিতে প্রকাশিত গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি নিয়ে বিদ্রূপ ও রসিকতা করার চেষ্টা এবং কিছু কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ও গালিবর্ষণের মধ্য দিয়ে বেওয়ারিশ সাহিত্যের বাগান চাষ করবার প্রবৃত্তি আজকাল যেন বড়ই বেড়ে উঠেছে। এই সব পত্র-পত্রিকা নিজেরা প্রায়শই অপাঠ্য। এর সম্পাদকেরাও প্রায়ই সাহিত্যিক হবার প্রাণান্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সম্পাদকত্বের সহজতর সোপানে খ্যাতিমান্ হবার অধ্যবসায়ে গলদ্ঘর্ম। অনেকেই সাহিত্যবোধ, সাহিত্যরুচি ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার ধার ধারে না, এমন কি অনেকে অর্ধশিক্ষিত। তবু ছদ্মনাম এবং নিজস্ব পত্রিকার নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে এদের ঔদ্ধত্য গগনস্পর্শ করতে চায়। সাহিত্যিক ও তাঁদের রচনা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা ও অসম্মানজনক উক্তি করতে এদের শিক্ষা ও রুচিতে একটুও বাধে না। যারা সাহিত্য স্পর্শ করবারও যোগ্য নয়, তারা নির্লজ্জ ধৃষ্টতায় সাহিত্যের সম্বন্ধে নির্বুদ্ধিতা-প্রসূত রায় দিতে অগ্রসর হয়।

সাহিত্য সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার মনোভাব যে জনসাধারণের মধ্যে

আজকাল অত্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, এ তারই এক দুর্লক্ষণ। এই উপসর্গের দ্বারা আরো বোঝা যায় যে, রচনা ও সৌষ্ঠবের উৎকর্ষের দ্বারা পত্রিকাগুলোকে জন-সমাদৃত করে তোলার চেয়ে, সস্তা ও কুরুচিপূর্ণ চুটকি পরিবেশন দ্বারা জনপ্রিয় হতেই আজকাল কাগজওয়ালারা বেশি পছন্দ করে। সাহিত্যে অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন যে, বর্তমানে বাঙলাদেশে সুসম্পাদিত পাঠযোগ্য কোনো সাহিত্য মাসিকের অস্তিত্বই প্রায় চোখে পড়ে না। আমি উঁচুদরের সাহিত্য-পরিবেশনের দাবিদার উন্নাসিক পত্রিকাগুলোর কথা বলছি না। কারণ, সেগুলোও প্রায়শ একদেশদর্শী ও সংকীর্ণবুদ্ধি-প্রসূত হলেও, নোংরা নয়। আমি সাধারণ মাসিকের কথাই বলছি। যাঁরা পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে কিছুটা উপভোগ, সম-সাময়িক সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে কতকটা পরিচয় এবং সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যরুচিকে ক্ষুণ্ণ না করে সময় কাটাবার একটা উপকরণ খোঁজেন তাঁদের পক্ষে অধুনা বাঙলা মাসিক সম্বন্ধে হতাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। মাসিক পত্রিকার যে এদেশে অপ্রাচুর্য আছে তা নয়, সেখানে ভালো লেখাও যে মাঝে মাঝে না বেরোয় এমনও নয়, তবুও ভরসা করে এমন কথা বলা শক্ত যে, অমুক পত্রিকা বেশ সুসম্পাদিত। যে-সব মাসিক পত্রিকা বহুদিনের এবং অতীতে যাদের কৃতী সম্পাদকেরা বহুদিনের চেষ্টায় নিজ নিজ পত্রিকার এক-একটি বিশেষ চরিত্র, সুনাম ও ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন, সেগুলি এখন ব্যবসাদার পরিচালকদের হাতে পড়ে পূর্বেকার ধাক্কার জোরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। গোড়ার দিককার সুসম্পাদনার জোরে এত বড়

হয়ে উঠেও এ-সব কাগজ এখনো সম্পাদনার মূল্য দিতে শেখেনি। নামজাদা কাগজদেরই যখন এই মনোবৃত্তি, তখন অনভিজ্ঞ পত্রিকা-প্রকাশকেরা যে সুসম্পাদনার কোনো মর্যাদা দেবে এরূপ আশাই করা যায় না।

নিজের প্রশংসা ও অপরের নিন্দা সর্বদাই মুখরোচক, এ-বিষয়ে সন্দেহ কী? তবুও নিন্দার একটা স্থান কাল আছে, পাত্রাপাত্র আছে, অধিকারীভেদও আছে। বাচ্চা ছেলে গুরুজনদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হলে সেটা কারুর কানেই ভালো শোনাবার কথা নয়। দুঃখের বিষয় বাঙলাদেশে সাহিত্য-সমালোচনার নাম করে অপর লেখকদের গালাগালি দেওয়ার একটা ধারা তৈরী হয়েছে। অপরের রচনা সম্বন্ধে বাঙালী সাহিত্যিকের মন সাধারণত গুণগ্রহেচ্ছু নয়, ছিদ্রান্বেষী। নতুন ও উদীয়মান সাহিত্যিককে সম্বর্ধনা করে সাহিত্যিক সমাজে স্বাগত জানাবার ঐতিহ্য বাঙলাদেশের নয়। এর দৃষ্টান্ত কাব্যবিশারদ থেকে শুরু করে অনেকেরই দংশন প্রবৃত্তিতে পরিস্ফুট হতে দেখা গেছে। বিশেষ করে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজ-পতি মহাশয়ের সম-সাময়িক সাহিত্যালোচনার রীতির আমি কোন-দিনই তারিফ করতে পারিনি। 'এই পত্রিকার নাম জাহ্নবী না রাখিয়া গাভী রাখা উচিত ছিল, কেননা ইহার সমস্ত রচনাই চর্বিত-চর্বণ', এই জাতীয় সর্বধ্বংসী উক্তিকে সমালোচনার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা শক্ত। কিন্তু তবুও সমাজপতি মহাশয়ের গালিবর্ষণের একটা সীমা ছিল, অভিজ্ঞ সাংবাদিক হিসেবে কাকে কী বলা যায়, আর কাকে কী বলা যায় না, এ সম্বন্ধে তিনি অনবহিত ছিলেন না।

অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে 'শনিবারের চিঠি' নিন্দাবাণ নিক্ষেপে বিশেষজ্ঞের খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ-পত্রিকার পরিচালকেরাও লঘু-গুরু সম্বন্ধে নিন্দনীয়রূপে নির্বিচার ছিলেন এবং গুণ-গ্রাহিতার কোনো পরিচয় দিতে সচরাচর অগ্রসর হতেন না। এঁদের গালাগাল অনেক সময় রুচিবিগর্হিত ছিল, একথাও সত্য। তবুও স্বীকার করতে হবে যে এ-নিন্দুকেরা কুশলী অস্ত্রচালক ছিলেন। গালাগাল-গুলোকেও উৎকৃষ্ট রসিকতায় ভিজিয়ে মুখরোচক করবার কৌশল তাঁরা জানতেন এবং সাহিত্যবোধ-বর্জিতও তাঁরা ছিলেন না। এবং এও লক্ষণীয় যে, সাহিত্যিক প্রতিভাকে অত্যন্ত অপরিপক্ক অবস্থাতেও চিনে নেবার ক্ষমতা এঁদের ছিল। যার প্রমাণ, যাঁদের গাল দিয়ে এঁদের কাগজ চলতো তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই পরবর্তী জীবনে যশস্বী সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এঁদের ছুর্মোচ্য কলঙ্ক রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধেয় উক্তি। কিন্তু মহীরূহ রবীন্দ্রনাথের গায়ে সে আঘাত সহজেই মুছে গেছে।

রচনাকৌশলের কৃতিত্বে আজ শনিবারের চিঠিকে হয়তো ক্ষমা করা যায়। কিন্তু অশিক্ষিত মন থেকে নির্গত, ছুর্বল লেখনী-প্রসূত নির্বোধ সমালোচনার জঞ্জাল নিতান্ত অসহনীয় মনে হয়। তুঃখের বিষয় বাঙলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধটা পরীক্ষা পাশ দিলেই লোকে মনে করে যে, সাহিত্য সম্বন্ধে নিবিচার মন্তব্য করবার তাদের অধিকার জন্মেছে। অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের এইরূপ বিষাক্ত আবহাওয়ায় আমাদের সাহিত্য যে এখনও বেঁচেবর্তে আছে এটাই আশ্চর্য।

১৮

চুট্‌কি

বিলেতের Strand magazine উঠে গেল। Nash's প্রভৃতি অনেক উঁচুদরের পত্রিকা অনেক আগেই উঠে গিয়েছিল। অপরপক্ষে বিলেত ও আমেরিকার চুট্‌কি লেখা ও ছিঁচ্‌কে রসিকতার কাগজগুলো ক্রমশই জাঁকিয়ে উঠছে। এদেশেও তার চাহিদা প্রচুর। দিশি কাগজও সেই পন্থা অনুসরণ করেছে। চুট্‌কি ও সস্তা রসিকতা, গালমন্দ কিংবা ঈষদুত্তেজক ছোট গল্পে ভর্তি করে কাগজ না বার করতে পারলে বাজারে চলে না। কেবল তাই নয়। ইদানিং লোকে আর মূল উপন্যাস পড়তে ততটা আগ্রহান্বিত নয়; বড় বড় প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা ইত্যাদি পড়বার দিকেও তার ঝোঁক বড় বেশি আছে বলে ঠাহর হয় না। তাই সবই Digest আকারে চাই। পঞ্চোপচারে সাজিয়ে ভোজনে বসবার সময় নেই। কাজেই ট্যাবলেট আকারে খাদ্য শিশিতে পুরে পকেটে রাখলেই হোল। জগতের যত কিছু জানবার, যত কিছু শেখবার, যত কিছু হৃদয়ংগম করবার মত তথ্য ও তত্ত্ব, সবই 'সাধারণ জ্ঞানে'র অসাধারণ চটিবইয়ের মলাটের মধ্যে আশ্চর্য কুশলতায় সীমাবদ্ধ। নোটবই-এর কল্যাণে ভারতের ইতিহাস, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস, ইউরোপের ইতিহাস, ভূগোল ও আরও নানা বৃহৎ বৃহৎ বিদ্যা কয়েক শ' পাতা পড়েই উদরস্থ হয়। শোনা যায় যোদ্ধা এবং অজ্ঞাত রাজ্যের

অভিযানকারীদের পক্ষে খাদ্যদ্রব্য ট্যাবলেট আকারে বহন করাই প্রশস্ত। এ-যুগে আমরা সবাই জীবনযুদ্ধের বীর সৈনিক, অথবা অদ্ভুত ও উদ্ভট রাজ্যের দুর্জয় অভিযানকারী। এ ক্ষেত্রে Digest আর চুট্‌কিই যে আমাদের জীবনের উপভোগ ও জ্ঞানার্জনের সম্বল এটা অসঙ্গত নয়।

পৃথিবীর লোকের কি এখন বড়ই সময়ের অভাব যে পূর্ণাঙ্গ বড় জিনিস পড়বার তাদের অবসর নেই? তা তো নয়। বরং অসংখ্য লোক বেকার, বাকি লোকের অবসরের পরিমাণ এত বেশি যে তারা কী করে সময় কাটাবে ভেবে পাচ্ছে না। সিনেমা থিয়েটারের ভিড় ক্রমবর্ধমান, রেস ফাট্‌কা আর তাসের জুয়ার নেশা ক্রমেই বেশি করে টান্‌ছে। চুট্‌কি কাগজের চাহিদা চার ছেড়ে পাঁচের অঙ্কের দিকে এই বাঙলাদেশেও এগিয়ে চলেছে। আশ্চর্য যে, বড় লেখা, বড় পড়া, বড় ভাবনার সময় তবু নাকি বড়ই সংক্ষিপ্ত।

বেশিদিন আগে নয়, এই সেদিন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন— 'তোরা চুট্‌কি ছাড়িয়া মহাকাব্যের মহা মহা খাতা বাঁধ।' কিন্তু আজ চাকা ঘুরে গেছে। আজকে মহাকাব্যের পাতা-গুলোকে ফের কুটি কুটি করে ছিঁড়ে চুট্‌কি ছড়ায় রূপান্তরিত করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ কবিতাও যথেষ্ট ছোট নয়। লিমেরিক কিংবা চার ছ' লাইনের পদ্য হলেই ভালো। সেদিনকার বিরাট বিরাট কেতাবের তুলনায় বঙ্কিমকেও সত্যেন্দ্রনাথ চুট্‌কি বলে গণ্য করেছিলেন—

"ছাখো ছ'শো পাতা রেগুলেশান নভেল
বটতলা লিখেছেন,
আর বঙ্কিম যার তুলনে চুটকি
Bamboo-র কাছে cane।
এখন যাহাদেব মতে বাঁশের চাইতে
কঞ্চি অধিক দড়,
শুধু তাহারা বলিবে চুটকি লেখক
বঙ্কিমবাবু বড়।"

কিন্তু এখনকার বিচারে বঙ্কিমবাবুও বিরাট। এখন সংক্ষিপ্ত কিংবা সংক্ষেপিত লেখা ও বই ছাড়া অন্য কিছু অচল। শুনতে পাই বঙ্কিমবাবুর বইয়ের চিত্ররূপ দেখতে যাবার আগে গিন্নিরা আর ছাত্ররা ঐ সব বইয়ের উপর দ্রুতগতিতে চোখ বুলিয়ে নেয়।

দেখা যাচ্ছে আমাদের মন অধুনা বড়ই করিৎকর্মা হয়ে উঠেছে। যে জায়গাটুকুতে ছু' একটা বিদ্যাই ভালো করে ধরতো না, সেখানে পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞাতব্য বস্তু ট্যাবলেট আকারে স্থান পেয়েছে। অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে আমরা একাধারে সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম, অভিনয় নৃত্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব বিষয় আয়ত্ত করে নিয়েছি। এমন কোনো স্কুল কলেজের ছেলে দেখা যায় না যে এর যে-কোনো বিষয়ে কিছু মন্তব্য ও মতামত প্রকাশে অক্ষম।

এই তৎপরতা, এই দ্রুতগতিতে সর্বকার্য সম্পন্ন করার অলৌকিক ক্ষমতা — এই হচ্ছে আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ। এই মোহময় আধুনিকতা এসেছে বিদেশ থেকে। বিদেশী নেতৃত্বে চুটকির স্টেনগান

স্কন্ধে নিয়ে আমরা জগজ্জয় করবার জন্য এগিয়ে চলেছি। ছাত্ররা এই সংগ্রামের সবচেয়ে উৎসাহী সৈনিক। আর বড় বই পড়তে হবে না। শুধু কাব্যসাহিত্যের সারমর্ম আর নোটবই মুখস্থ করলেই যথেষ্ট। আর, অবসর বিনোদনের জন্য লেখকের ডাইজেস্ট, পাঠকের ডাইজেস্ট, ডাইজেস্টের ডাইজেস্ট, তস্য ডাইজেস্ট, ইত্যাকার সংক্ষিপ্তসারের অভাব নেই। কিন্তু আমার মত সেকেলে মানুষ, যে টুকরোর চেয়ে আস্তটাই পছন্দ করে, ট্যাবলেট খেয়ে শরীর রক্ষা করার চেয়ে নানাব্যঞ্জনে তৃপ্তি পেতেই ভালোবাসে তার পক্ষে পছন্দমত জিনিস খুঁজে পাওয়া উৎকৃষ্ট পাত্র খুঁজে পাওয়ার চেয়েও শক্ত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

যদি এইরূপ বিশ্বাস মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দেওয়া যেত, যে জগতের লোকের পাঠের ঝোঁক যখন ক্রমশই চুট্‌কি ও সংক্ষিপ্তসারের দিকে, তখন বৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ উচ্চ সাহিত্যের দিন একেবারেই গেল, তাহলে সাহিত্যচর্চা ছেড়ে দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কিছুতেই এ বিশ্বাস মন থেকে দূর হতে চায় না যে জগতের এ ক্ষুদ্রতার দিকে ঝোঁকটা নেহাৎই সাময়িক। কেবলই মনে হয়, এমন সময় বেশি দূরে নয় যেদিন মানুষ সাংসারিক ও সামাজিক কর্মতৎপরতার থেকে মানসিক চাঞ্চল্য ও অব্যবস্থিতচিত্ততাকে আলাদা করে দেখতে শিখবে, যেদিন আর চপলতাকে কর্মতৎপরতা বলে ভুল হবে না। সব শিল্পসাধকই হয়তো একথা মনে মনে বিশ্বাস করেন। নতুবা বড় চিত্রকর উচ্চ চিত্রশিল্পসৃষ্টির প্রেরণা পান কোথায়? আর কেনই বা বড় কবি ও সাহিত্যিক আজো উঁচুদরের সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস পান?

১৯

বাল্যশিক্ষার পাঠ্যাপাঠ্য

নিষিদ্ধ ফলের প্রতি মানুষের আগ্রহ দুর্বার — একথা সকলেই জানেন। একারণে বাল্যকালে বড়দের গল্প বা উপন্যাস বলে চিহ্নিত বইগুলি ছোটবেলায় আমাদের লুকিয়ে পড়তে হয়েছে। এটা করবে না ওটা করবে না বলে লোককে শাসানো যে একেবারেই নিষ্ফল ও পণ্ডশ্রম, দাগী আসামীদের কাণ্ডকারখানা দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। স্টেইট বা রাষ্ট্র বলে যে সহানুভূতিহীন যন্ত্র আছে, সে কখনো চোরকে বলে না যে চুরি না করে এই কাজটা দিচ্ছি, এটা করো, এতে তোমার এই এই ভালো হবে। সে কেবলমাত্র বলে চুরি কোরো না, চুরি করলে সাজা পাবে। সে কারণে যে একবার চুরি করে, পাকা দাগী চোর না হয়ে তার আর উপায় থাকে না।

কথা হচ্ছে এই যে, বাল্যকাল থেকে মানুষ যদি কেবল নিগেটিভ্ বা নেতিবাদের পথে চালিত হয়, তবে সে অবশ্যই অপটু, কর্মবিমুখ, উদ্যমহীন ও আয়েসী হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আর পড়াশুনোর ব্যাপারেও যদি নিষেধাজ্ঞার ভারি ভারি দেয়াল চারদিকে খাড়া করে দেওয়া যায়, তবে ছেলেমেয়েরা হয় লুকিয়ে নিকৃষ্ট বইগুলোই পড়বে, নতুবা বই পড়ার উৎসাহই তাদের স্তিমিত হয়ে যাবে। ফলে তাদের না হবে ভাষাজ্ঞান, না হবে কোনো ভালো রচনা হৃদয়ঙ্গম করবার ক্ষমতা।

সাম্প্রতিক প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল দেখে এসব কথা বিশেষভাবে মনে হচ্ছিল। পরীক্ষার ফল অনেক ছাত্র ও তাদের অভিভাবকদেরই পক্ষে মর্মান্তিক হয়েছে, এটা আমাদের মত দরিদ্র দেশের ব্যয়বহুল শিক্ষার পক্ষে অতি দুঃখের, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অনেক ছেলেমেয়ে মোটামুটি ভালো ছাত্র হলেও দৈব-দুর্বিপাকে দু-এক বিষয়ে খারাপ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি, একথাও সত্য। কিন্তু অধিকাংশ পরীক্ষার্থী যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার যোগ্যই নয়, একথাই বা অস্বীকার করা যায় কী করে?

অন্য বিষয়ের কথা ছেড়ে দি, একটি চৌদ্দ পনেরো বছরের ছেলে অনেক বছর স্কুলে পড়ার পরও তার মাতৃভাষায় কী করে এত কাঁচা থাকতে পারে, তা কল্পনা করাই শক্ত। আমি নিজে পরীক্ষক নই, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের কল্যাণে কিছু প্রবেশিকা পরীক্ষার খাতায় চোখ বুলানোর সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। তাতে দেখেছি যে অধিকাংশ ছাত্রের নিজের মাতৃভাষা বা নিজেদের সাহিত্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র প্রাথমিক জ্ঞানও নেই। যে দেশের সাহিত্য সর্ববিভাগে এত সমৃদ্ধ, সে দেশের পক্ষে এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় বৈকি। এতে বুঝতে হবে যে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরুতর গলদ আছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় গলদ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষক বা ইস্কুলের শিক্ষকদের প্রতি সমাজিক অবজ্ঞা ও আর্থিক অবহেলা। জাপান-ফেরৎ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে শুনেছি যে, সেখানে কলেজের ছেলেরা কোনো অধ্যাপকের বিদ্যাবত্তা ও অধ্যাপনার উচ্চ প্রশংসা করতে হলে বলাবলি করে যে ইনি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হবার যোগ্য। তার

সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বনিয়াদ রচয়িতাদের তুলনা করলে আমাদের ছাত্রদের পশ্চাদ্বর্তিতার কারণ সহজেই বোঝা যায়।

যাই হোক, শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, এই সব গলদ সত্ত্বেও আমরা আমাদের ঘরের ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে যেটুকু করতে পারি সেটুকু করি কিনা, সেটাও বিবেচনা করা দরকার।

বড়দের বই সম্বন্ধে নিষেধের কড়া দেয়াল তুলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে আমরা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট অংশের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচয়ে বাধা জন্মাই, সেকথা খুব কম অভিভাবকই বোঝেন বা বুঝতে চান। বারো তেরো বা চৌদ্দ বছরের ছেলে বাইরের গল্প উপন্যাস পড়বেই, তা সে বড়দেরই হোক, আর ছোটদেরই হোক। যদি বড়দের বই বলে ভালো-মন্দ সব বই সম্বন্ধে ঢালা নিষেধ জারি করা যায়, তবে সেটা তাদের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার দুই-ই হবে। কী হয় ছেলেরা যদি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে? তাতে অন্তত তারা বাঙলা ভাষাটা তো শিখতে পারে। আপত্তি করবেন ওসব বইয়েতে প্রেমের কথা আছে বলে? কিন্তু কই আপনার স্ত্রী যখন ছয় থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত চারটি এণ্ডাবাচ্চা নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারে যান, তখন তো আপত্তি করেন না। আর সিক্‌স্‌থ ক্লাসে উঠেই যখন ইস্কুলের ছেলেরা বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে মোহন সিরিজের বই পড়ে তখন তো কই আপনার নিষেধাজ্ঞা খাটে না। তাছাড়া এটা আমি খুব ভালো করেই লক্ষ্য করে দেখেছি যে কোনোরূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করে কৌতূহল জাগ্রত না

করলে ছোট ছেলেরা প্রেমের মনস্তত্ত্বে কোনোরূপ ঔৎসুক্যই বোধ করে না।

এ গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাষাশিক্ষা ও রচনানীতি আয়ত্ত করার পক্ষে কবিতা পাঠ যে অতি উৎকৃষ্ট সহায়, এটা সর্বজনবিদিত। পাঠ্য বইয়ে তারা যে ক'টি কবিতা পড়ে, তার নির্বাচন প্রায়ই অর্থহীন, সেগুলির অধ্যাপনার পদ্ধতিও নীরস ও ব্যর্থ। কিন্তু আমরা অভিভাবকেরা সহজেই কবিতা পাঠে বালক-বালিকাদের উৎসাহিত করতে পারি। প্রথম প্রথম একটু চিত্তাকর্ষী ছন্দের ভালো ভালো ছড়া ও কবিতা দিয়ে ছোটদের প্রলুব্ধ করে সহজেই তাদের মন কবিতার দিকে অনেকটা টেনে আনা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখেছি অনেক অভিভাবক ছোটদের কবিতা বড়দের কবিতা বাছাবাছি করে' ছোটদের যথেচ্ছ কাব্যপাঠে বাধা জন্মান।

তৃতীয় কথা, আমাদের অধিকাংশ অভিভাবকই ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো ভালো লেখকের উৎকৃষ্ট বই কিনে এনে দিতে অভ্যস্ত নন। ছেলেমেয়েরা নিজেরাই চেয়ে-চিন্তে বা কিনে, যা পায় তাই এনে পড়ে। যদিও কখনও ছোটদের জন্য বই কিনতে হয়, তবে অধিকাংশ অভিভাবক বিনা দ্বিধায় নির্বিবেক প্রকাশকের দ্বারা প্রচারিত ভুল বাঙলা ভুল তথ্য ও কুৎসিত রুচিপূর্ণ অবাস্তব কিন্তু সস্তা বই-ই কিনে আনেন। দু'চার আনা পয়সা বেশি খরচ করে ভালো লেখকের ভালো বই কিনে আনা তাঁরা অমিতব্যয়িতা বলে মনে করেন। এরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষা দিতে বসে ছেলেরা যদি তিন লাইন বাঙলা লিখতে হাঁপিয়ে ওঠে,আর পরীক্ষায় ফেল করে, তবে আর দোষ দেব কাকে ?

২০

সাহিত্য সংকলন ও মাইনর লেখক

অতি উচ্চস্তরের লেখক না হলেও অনেক লেখকের রচনার মধ্যেই যে প্রকৃত উচ্চ-সাহিত্যের স্ফুলিঙ্গ থাকে, একথা অস্বীকার করা যায় না। মাঝারি সাহিত্যে এমন অনেক জিনিস থাকে, যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত ও গদগদ হতে না পারলেও সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে তাদের ফেলে দেওয়া যায় না। তাদেরও রাখতে হয় সাহিত্যের সঞ্চয়-মঞ্জুষায় জমা করে। এ-সব রচনার লেখকেরা সাহিত্যের ইতিহাসে অপ্রধান বা মাইনর লেখক বলে পরিচিত। এঁরা সুউচ্চ-কীর্তি না হলেও সাহিত্যে উচ্চ-মানের প্রবাহ রক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, আর কিছু না করে শুধু প্রবাহ রক্ষা করারও একটা বিরাট সার্থকতা আছে। জগতে ভালো সাহিত্যের প্রবাহ রক্ষা করার মূল্যও যে অবজ্ঞেয় নয়, একথা সাহিত্যিকদের, সাহিত্যপাঠকদের এবং সাহিত্যের পাঠ্য-তালিকা রচয়িতাদের সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য।

যে-কারণে ইংরেজি কাব্য-সঙ্কলন বিশেষভাবে উপভোগ্য এবং দীর্ঘ অবসর-বিনোদনের প্রকৃষ্ট সহায় সে হচ্ছে সংকলিত কবিতা-খণ্ড-গুলির বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য। বহু লেখকের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা-কৌশলের সমাবেশের দরুন পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত রাখবার ক্ষমতায় এরা বিশেষ সমৃদ্ধ। সব সময় সকল রকম মনোভাব নিয়ে

কেবলই বড় বড় কবিদের উঁচুদরের লেখা পড়েই সময় কাটানো যায় না। তা হলে লোকে যেটুকুও বা কবিতা পড়ে, হয়তো তাও পড়তো না।

দুঃখের বিষয় বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনতিউচ্চকীর্তি লেখকদের কোনোরূপ মর্যাদা দিতে আমরা একেবারেই নারাজ। অবশ্য যে সব 'মহাকবি'র নামে বাঙালী উচ্ছ্বসিত হয়, তাঁরা অনেকেই মাইনর লেখক বলেই পরিগণিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি, তবু এটা বিস্ময়কর যে মহালেখক বা মহাকবি না হওয়া পর্যন্ত বাঙালী পাঠক কোন লেখকেরই রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায় না এবং সে-পরিচয় লাভের জন্য কোন আগ্রহও বোধ করে না।

বাংলা সংকলনগুলির দিকে তাকালেই বাঙালী সম্পাদকদের 'নাম' মোহ প্রকট হয়ে ওঠে। বাঙালী সাহিত্য পড়ে না, 'নাম' পড়ে। যাঁরা সংকলন করেন, তাঁরাও তথৈবচ। নামজাদা লেখকদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল রচনায় প্রায়ই সংকলনগুলির কলেবর বৃদ্ধি করা হয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্বল্পকীর্তি বিস্মৃত বা অর্ধবিস্মৃত লেখকদের রচনাবলী থেকে খুঁজে প্রকৃত ভালো রচনা সন্নিবেশিত করার মত ধৈর্য অথবা বিচারশক্তি অধিকাংশ সংকলয়িতার মধ্যেই অনুপস্থিত বলে মনে হয়। কাব্য-সংকলন-গুলিতে রবীন্দ্রোত্তর বহু মাইনর কবির বাজে রচনা স্থান পায় বটে, কিন্তু সেটা চক্ষুলজ্জার খাতিরে — বিচারশক্তির প্রয়োগের ফলে নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্রপাঠ্যরূপে প্রচারিত গদ্য ও পদ্য সংকলনগুলি

'নাম' এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বিবেচনা করেই নির্বাচন করা হয়েছে, এরূপ সন্দেহ না করে পারা যায় না। এ কারণেই দেখা যায় যে, বাঙালী এম-এ-ই পাশ করুক কিংবা বি-এ-ই পাশ করুক, বাঙলা সাহিত্যের কয়েকটি বড় নাম ছাড়া সে আর কিছুই জানে না এবং কয়েকজন অন্য ক্ষেত্রে কৃতী বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সে বড় সাহিত্যিক বলে বিশ্বাস করতে শেখে।

অনতিউচ্চ লেখকেরা যে নিতান্ত নগণ্য নন তার প্রমাণ নিজের কালে এঁদের অনেকেই প্রতাপশালী এবং অগ্রগণ্য সাহিত্যিক বলে পরিগণিত হয়ে থাকেন। অনেক বড় লেখকদেরও এঁদের তোয়াজ করে জাতে উঠতে হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে বার করা অসম্ভব নয়। মুশকিল হচ্ছে, মহাকালের বিচার শেষ হবার আগে লেখকদের জাত মান প্রকৃতি ও আয়ুর পরিমাণ ঠিক মত বুঝতে পারা ভারি শক্ত। মুষ্টিমেয় পাঠক, যাঁরা সাহিত্যের দীর্ঘকালব্যাপী চর্চায় এ বিষয়ে খানিকটা সঠিক অনুমান করতে পারেন, তাঁরা রসের সায়রে ডুব দিয়ে বোবা হয়ে বসে আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে, বর্তমানের বড় মাঝারি ও ছোট লেখকদের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের মেজর লেখক ও মাইনর লেখক বাছাই করা যখন যাচ্ছেই না, তখন সমসাময়িক-কালের অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাত লেখকদের সম্বন্ধে নাক সিঁটকোনোরও যেমন মানে হয় না, অতীতের মাইনর লেখকদের সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য-বিজ্ঞতার ভড়ং করারও কোনোরূপ তারিফ করা চলে না। সাহিত্যের সংযোগরক্ষার সেতুগুলি বাদ দিয়ে টুকরো টুকরোভাবে সাহিত্য পাঠে অভ্যস্ত বলেই আমরা সব জায়গা থেকে কুড়িয়ে

এনে শ্রেষ্ঠ লেখার সংকলন করতে শিখি না, সংকলনের নামে বড় জোর বিয়ের উপহারের বই করে ফেলি।

বাংলা সাহিত্যে কবিতাই সব। মহাকাব্য, চরিতকাব্য বা মঙ্গলকাব্যই হোক আর গীতি-কবিতাই হোক, রামমোহন বিদ্যাসাগরের আগে আর বাঙলা গদ্য-সাহিত্য কী আছে? আর কাব্য মানেই তো বাঙলায় ছিল গান। সব কাব্যই গান করে শ্রোতাদের পরিবেশন করা হোতো। সাধারণ লোক সুর আর কাহিনীতে মগ্ন থাকতো, বোদ্ধারা সাহিত্যরস আহরণ করতেন। কিন্তু অধুনা বাঙলা ভাষায় প্রায় যে কোনো সংকলন খুললেই দেখা যায় যে বাঙলা গানের একটা শ্রেষ্ঠাংশই সেখানে অনুপস্থিত। সেখানে মঙ্গলকাব্যের অংশ, ফকির বাউলের গান, লোকসঙ্গীত ও ছড়ার শ্রেষ্ঠাংশ, এমন কি অনেক অগ্রগণ্য ভক্ত কবিদের গান পর্যন্ত অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রসিকগণের কৃপায় এখন বহু হারামণির সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু কাব্য সংকলয়িতারা সেগুলোকে আমল দেননি। এর একমাত্র কারণ বাঙালী সাহিত্যজ্ঞানগর্বীদের অনেকেরই সাহিত্য-পাঠ কয়েকজন নামজাদা লেখকের রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এঁরা 'মেজর' ও 'মহা' লেখকদেরই নাম শুনে তাঁদের লেখা পড়ে থাকবেন। আর, যে দু'খানা বাংলা কবিতার বই পড়েছে সেই তো এদেশে বাংলা সাহিত্যের মহাবোদ্ধা। এ কারণে যদিও এনতার কাব্য-সংকলন বেরুচ্ছে, তবু সংকলনের সব গুণই অধিকাংশ সংকলনে অনুপস্থিত। সেগুলিতে পাওয়া যায় শুধু অতিপরিচিতনামা লেখকদের কয়েকটি অতিপরিচিত রচনা।

সেগুলিতে কোনো নতুনত্ব কিংবা বৈচিত্র্য নেই এবং সেগুলি অতি একঘেয়ে এবং অবসরবিনোদনের অযোগ্য।

তথা-কথিত মাইনর লেখকেরা প্রত্যেক দেশের কাব্য-সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অংশের রচয়িতা। এঁরা নিজেদের রচনায় যতখানি সার্থকতা আয়ত্ত করতে পারুন বা নাই পারুন, এঁদের মধ্যে অনেকেই কনিষ্ঠ বা পরবর্তী সাহিত্যিকদের প্রেরণা জোগান। এ কারণে সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন এঁরা সুপ্রতিষ্ঠ, সাহিত্যের ছাত্রদেরও অবশ্য পরিচয়যোগ্য। অন্যান্য সাহিত্যের মত বাঙলা সাহিত্যের একটা উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ অংশ যে অজ্ঞাতনামা লেখকদের লেখা একথা কে না জানে? লোক-সাহিত্য এবং পদাবলী-সাহিত্যের অজ্ঞাত ও প্রচ্ছন্ননামা লেখক তো অসংখ্য। এখানে নামজাদা বা মেজর-মাইনরের প্রশ্ন ওঠে না। ভালো-মন্দ লেখার প্রশ্নই সর্বপ্রধান।

শেয়াল যেমন ঠ্যাং ছেড়ে লাঠি ধরেছিল, আমরা তেমনি সর্বদাই লেখার গুণ ছেড়ে দিয়ে নাম ধরে বসে আছি। কে লিখেছেন? না অমুকে। অতএব সেটা পড়ানো হোক স্কুলে কলেজে, তাই নিয়ে উচ্ছ্বাস চলুক ধুমসো মাসিকের পৃষ্ঠায়, আবেগে গদগদ কণ্ঠ কেঁপে উঠুক সাহিত্য সভার তামাসায়। কার লেখা বই? না অমুকের। অতএব কিনে আনো পাঁচখানা পাঠাগারের জন্য, আরো পাঁচখানা উপহারের। ড্রয়িংরুমে বসে গল্প করা চলুক — অমুক বাবুর latest বই পড়েছেন? চমৎকার কিন্তু। অথচ হয়তো এতই কৌতূহল-বর্জিত নিরেট সে লেখা যে তিন পাতা পড়তে গলদঘর্ম হতে হয়। এদিকে কোনো নবীন সাহিত্যিক হয়তো প্রতিভা ও অভিনিবেশের প্রয়োগে

একখানি সত্যিকারের ভালো বই লিখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কাগজে কাগজে আর নামজাদা সাহিত্যিকদের দুয়ারে দুয়ারে — দু'ছত্র প্রশংসাপত্রের আশায়। কেননা তাকে বই বিক্রী করতে হবে, তাকেও বাঁচতে হবে।

চিরকালের মেজর-মাইনর লেখকের কথা ছেড়ে সমসাময়িক কালের মেজর-মাইনরে পৌঁছে গেলাম বলে পাঠকেরা ক্ষমা করবেন। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, বাংলা দেশে সাহিত্যিক বিচার খুব কমই চোখে পড়ে।

নামের মোহ সব দেশেই আছে এবং থাকা স্বাভাবিক, কেননা ওটা একটা মানবিক দুর্বলতা। কিন্তু সব দেশেই পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও তৎসংশ্লিষ্ট সমালোচকেরা বুদ্ধিমান, সাহিত্যরসিক ও সাহিত্য বিচারে পারদর্শী হয়ে থাকেন। এদেশের মত সাহিত্যবোধহীন ব্যক্তিকে সম্পাদক রেখে কোনো দেশেই 'বড়' এবং 'নামজাদা' কাগজ চলে না। অন্যান্য দেশে সমালোচকেরা বই পড়ে সমালোচনা করেন, মলাট এবং নাম দেখে নয়। ভালো লেখকও অন্যান্য দেশে অপাঠ্য বই লিখে রেহাই পাবেন না একথা তাঁরা ভালো করে জানেন বলেই যা তা লিখে বাজারে ছাড়তে তাঁরা সাহস পান না। অপরপক্ষে নবীন লেখক প্রাণপণ যত্নে বই লেখেন, কারণ তাঁরা জানেন যে বই যদি প্রকৃতই ভালো হয়, তবে তা সমালোচকের দৃষ্টি এড়াবে না এবং ফলে তাঁর সাহিত্যিক যাত্রার পথ সুগম হবে।

২১

বিলীয়মান লোকসাহিত্য

ছোটবেলায় সব রকম গল্পের মধ্যে রূপকথাই শুনতে ও পড়তে সবচেয়ে ভালো লাগে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছোটরা সেকথা কাগজে লিখে জানাতে পারে না, সভা করে কিম্বা স-ঝাণ্ডা মিছিল বার করে 'আমাদের দাবি মানতে হবে' বলে চেঁচাতেও পারে না। এক্ষেত্রে "যাহা পায় তাহাই', গলাধঃকরণ করা ছাড়া তাদের আর উপায় কী? আমি যতদূর জানি, আমাদের দেশে দু'খানি মাত্র দেশীয় রূপকথা বা লৌকিক উপাখ্যানের বই আছে যা উল্লেখযোগ্য। প্রথম 'ঠাকুরমার ঝুলি'; দ্বিতীয় 'টুনটুনির বই'। এ ছাড়া বিদেশী রূপকথা থেকে ভাষান্তরিত বা রূপান্তরিত অনেক বইয়ের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু দেশী লৌকিক উপাখ্যানের আর কোনো বইয়ের কথা মনে আসছে না? অথচ আমাদের দেশের প্রচলিত রূপকথা অসংখ্য এবং অজস্র যার তুলনায় সংগ্রহ দু'টি একান্তই অসম্পূর্ণ।

'ঠাকুরমার ঝুলি' যখন বেরোয়, তখন রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। দেশী ও বিদেশী কাগজে কাগজে এ-সংগ্রহের প্রচুর প্রশংসা বেরিয়েছিলো। দেশের ছোটরা পরমানন্দে এতই আগ্রহ সহকারে একে লুফে নিয়েছিলো যে সংগ্রহকর্তা তাঁর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার সুফল রজতমূল্যেও যথেষ্টই পেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'ঠাকুরমার ঝুলি' আজও এক এবং অদ্বিতীয় হয়েই

রইলো। সংগ্রহকর্তা খ্যাতি এবং সাফল্য অর্জন করে ব্রতকথা, গীতিকথা ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত সহজে সংগ্রহযোগ্য গ্রন্থ রচনা করলেন বটে, কিন্তু রূপকথার গবেষণায় আর বেশিদূর অগ্রসর হলেন না। এরপর 'টুনটুনির বই' অতি উপাদেয় সংগ্রহ হলেও তা ঠিক রূপকথা নয়, তাকে উপকথা-সংগ্রহ বল্লেই বোধ হয় ঠিক হয়।

অথচ অসংগৃহীত রূপকথা আমাদের দেশে আরো এত আছে এবং আরো এত অসংখ্য ছিল যা পুনরুদ্ধার করা আজ প্রচুর কষ্ট ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুরোনো প্রচলিত রূপকথাগুলি যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কোনো উৎসাহী সাহিত্যিক দ্বারা এদের সংগ্রহ আজ জরুরি প্রয়োজন। তার প্রথম কারণ, প্রশান্ত জীবনের পরিবেশে যে ঠাকুমা-দিদিমার দল এসব গল্প মুখ থেকে মুখে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, সে ঠাকুমা-দিদিমার দল লুপ্তপ্রায়। দূরতম পল্লীতেও আজ প্রলয়ের আলোড়ন পুরোনো ইমারতের ভিত্ ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে যাচ্ছে। গল্প মনে রাখবার কিংবা শোনাবার অবসর ও প্রবৃত্তি আজকের বুড়ি-বুড়োদের আর নেই। গল্প আজ বলেই বা কে, শেখেই বা কে, শোনায়ই বা কে? কিন্তু অবিলম্বে এই সংগ্রহ-প্রচেষ্টায় হাত দেবার তার চেয়েও বড় কারণ আছে। তা হচ্ছে এই যে বাংলা দেশের অধিকাংশটাই আজ বিদেশ। তার কিছু পাকিস্থান, কিছু বিহার, কিছু বা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত জায়গাতেই বাঙলার সংস্কৃতির মূলোৎপাটনের চেষ্টা চলেছে। এই বিষক্রিয়ার ফলে এসব জায়গায় প্রচলিত বাঙলা রূপকথা বা ছড়া প্রভৃতি

লৌকিক সাহিত্য হারিয়ে যাওয়া বা বিকৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত গুরুতর। সময়ও বেশি আছে বলে মনে মনে হয় না। এখনো যদি এগুলিকে সংগ্রহ করে রাখার কাজে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হাত না দেন তবে বহু দুর্লভ ঐশ্বর্য হারিয়ে যাবে। হয় তো কোনোদিনই তাদের আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

যাঁরা বংশানুক্রমে শহরে বাস করেন এবং বৈদেশিক সংস্কৃতির ধারায় শিক্ষিত, তাঁরা ধারণাই করতে পারবেন না বাঙলাদেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, আরো কতো বিচিত্র রূপকথা ও লৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন জেলাতেই বা তাদের কত বিভিন্ন বিচিত্র রূপ! কোনো জায়গার লোকসাহিত্যে যেমন মগ ও পার্বত্য লোকসাহিত্যের ছায়া, কোথাও তেমনি গারো-হাজং-খাসিয়া জাতির রূপকথা ও উপকথা মিশে তাদের নতুন নতুন কল্পনায় সমৃদ্ধ করে রেখেছে। ওদিকে আছে সাঁওতাল, ভীল জাতির লোকসাহিত্য। বাঙলার লোক-সাহিত্যের বিশাল নদ যে কত অসংখ্য ধারার দানে সমৃদ্ধ সে কথা আমরা জানি না কিংবা ভুলে থেকে নিশ্চিন্ত রয়েছি।

সত্য বটে এ জাতীয় লোক সাহিত্য সংগ্রহ করতে হলে তার জন্য প্রচুর অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও ধৈর্য দরকার। অনেক জায়গায় ঘুরে, অনেকের মুখ থেকে শুনে সে সব লিখে আনতে হবে। ধৈর্য হারালে চলবে না, শারীরিক কষ্ট অনেক পরিমাণে তুচ্ছ করতে হবে। সত্য বটে কাজটা কিছু পরিমাণে ব্যয়সাপেক্ষ। এ কাজে যিনি যাবেন তাঁর খানিকটা সাহিত্যবোধ, লেখবার ক্ষমতা এবং সাহিত্যানুরাগ থাকতে হবে — এও ঠিক। গবেষকের

অভিনিবেশ ও একাগ্রতা নিয়ে তাঁকে কাজ করতে হবে। কিন্তু যদি তিনি এ কাজ করতে পারেন তাহলে তাঁর কেবল একটা বিরাট কীর্তিই থেকে যাবে না, আর্থিক সাফল্যও তাঁর সুনিশ্চিত।

বর্তমানে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা বয়সের, নানা শ্রেণীর, নানান পল্লীর অসংখ্য উদ্বাস্তু দলে দলে কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ অনেকে আছেন, যাঁরা পুরোনো রূপকথা ইত্যাদি যেমন জানেন, তেমনি পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত বহু ছড়া, গান, গল্প প্রভৃতির সন্ধান রাখেন, যা এখন লিপিবদ্ধ করে না রাখলে ভবিষ্যতে আর খুঁজে পাবার কোনোই সম্ভাবনা থাকবে না। এক কলকাতাতে বসেই পূর্ববাংলার দূর দূরান্তের নানা জেলার নানা পল্লীর বাসিন্দাদের হাতের কাছে পাওয়ার সুযোগও ভবিষ্যতে আর না আসতে পারে। এ সময় কোনো উৎসাহী তরুণ সাহিত্যিক ঘুরে ঘুরে পল্লীগাথাগীতি ও গল্প সংগ্রহে অবতীর্ণ হলে তাঁর নিজের এবং বাঙলা সাহিত্যের উভয়েরই মঙ্গল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সত্য বটে উদ্বাস্তুদের মনের অবস্থা বর্তমানে গল্পগাথা নিয়ে মাতামাতি করবার মত নয়। কিন্তু তাঁদের অনেকেই আজ গুরুতর অভাবগ্রস্ত। এবং গল্প-গাথার মত তুচ্ছ জিনিস শুনিয়ে যদি কিছু উপার্জন করা সম্ভব হয়, তবে তাঁদের অনেকেই উপকৃত হবেন এবং খুশি হয়েই একাজে উৎসাহিত হয়ে উঠবেন। এই সব দেশছাড়া লোক, যাঁরা দেশের লোকসাহিত্যের ঐশ্বর্য ও পল্লীসংস্কৃতিকে আজ কেবল মনের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যেই বহন করে রেখেছেন, তাঁদের সে

পুঁজি পাঁচজনের মনোরঞ্জনের জন্য ছড়িয়ে দিতে পারলে তাঁরাও তৃপ্তি পাবেন বলেই আমার বিশ্বাস। বর্তমানের এই যুগান্তকারী প্রলয়পয়োধির মধ্য থেকে আমাদের বিলীয়মান লোকসাহিত্যের রত্নগুলি খুঁজে কুড়িয়ে আনতে পারেন, বাঙালীর মধ্যে যদি এমন কেউই না থাকেন, তবে সেটা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের কথা।

কেবল পুরাতন গল্প-গাথা, আখ্যান-উপাখ্যান, ছড়া আর গানই নয়, সামাজিক জীবনের দ্রুত ধ্বংসের ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনই এক সঙ্কট-মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া পৃথিবীতে হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা যত বিস্তৃতি লাভ করছে, আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রসগ্রাহিতা ও বিচারবুদ্ধি ততই বিকৃত কিংবা বিনষ্ট হতে চলেছে, এ বিষয়েও এখন আমাদের যথেষ্ট অবহিত হবার কারণ ঘটেছে। যে সব বাস্তুচ্যুত বাঙালী নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চিরকালের জন্য বিদেশে এসে শিকড় গাড়বার চেষ্টা করছেন, তাঁরা এতকাল এত যুগযুগান্ত ধ'রে যে স্থানীয় আচার-ব্যবহার শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতিকে অন্তরঙ্গ করে নিয়েছিলেন সে তো গেলই। কিন্তু তার চেয়েও যেটা বড় কথা, আজ পূর্ববঙ্গে যত বাঙালী আছেন — আমি হিন্দু-মুসলমান উভয়ধর্মীয় বাঙালীর কথায় বলছি — তাঁরাও কি বাঙলার লৌকিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যটুকু আর বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন ? বাঙলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নামে ও ধর্মে যে পার্থক্যই থাক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল বলে কখনো লক্ষ্য করি নি। উভয় সম্প্রদায়ই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম ও পুরাণ-কথার কিছু কিছু জানতো, উভয়ে উভয় সম্প্রদায়ের

পাল-পার্বণ উৎসবে যোগ দিত এবং এই সব উৎসব-অনুষ্ঠান সমান উৎ-সাহের সঙ্গেই উপভোগ করতো। লৌকিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিন্দু-মাত্র পার্থক্য ছিল বলে আমাদের কখনোই মনে হয় নি। মুসলমান ঠাকুমা বাঙলাদেশের পল্লীতে বসে যে তাঁর নাতিকে রাজপুত্র রাজকন্যা রাক্ষস-খোক্কস আর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প শোনান নি এ অসম্ভব, যদিও হয়তো তাঁরা রাজপুত্রকে শাহজাদা বলে থাকবেন। ছেলে-ভুলোনো ছড়া কিংবা লোকসঙ্গীতে কোনদিন হিন্দু-মুসলমান পার্থক্য ছিল, এমন কথা কেউই বলবে না। ফকির বাউল দরবেশের গানগুলি বাদ দিলে বাঙলাদেশের পল্লীসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠাংশই বাদ পড়ে যাবে। ধর্ম ভিন্ন যাবতীয় ব্যাপারে, লৌকিক আচার-ব্যবহারে, চিন্তায় ও কর্মে, খাদ্যে ও পানীয়ে, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে চিরকালই বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে এক ছিল। বাঙলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল যে সে বাঙালী। কিন্তু এখন পূর্ববঙ্গের বাঙালীদের ঝোঁক হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাঙালীত্বকে যথাসম্ভব বিসর্জন দিয়ে পাকিস্থানীত্ব অর্জন করা। একজন পেশোয়ারী কিংবা পাঞ্জাবী মুসলমানই তার আপনজন, এ-কথা সে মেনে নিয়েছে,— যদিও খাদ্য, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি কিংবা জীবনযাত্রায় এদের দু'জনের মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল নাই। অনুরূপ প্রক্রিয়া যে বাঙলাদেশের এ দিকটাতেও শুরু হয় নি বিবেককে ক্ষুণ্ণ না করে এমন কথা বলা শক্ত। এরূপ ক্ষেত্রে বাঙলার বিশিষ্ট সংস্কৃতি যে আপন্ন এ কথা মনে করবার হেতু আছে।

কিন্তু শুধু এইটুকুই মাত্র নয়। আরো বড় কথা এই যে, যে সম্প্রদায় বিভিন্ন স্থানীয় হলেও এক বলে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, সেই একই সম্প্রদায়ের বিভিন্নস্থানীয় লোকদের মধ্যেও পরিস্পরিক বিদ্বেষ ইদানিং অত্যন্ত উগ্র হয়ে দেখা দিচ্ছে। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যা বলতে গেলে বৃহত্তর বাঙলাদেশেরই অংশ বলে স্বীকৃত এবং যেসব জায়গার সংস্কৃতি ও সাহিত্য বাঙলার দানেই প্রাণবন্ত, সে-সব জায়গাতেও বাঙলা সংস্কৃতি বিতাড়নের চেষ্টা চলেছে। যদিও রাষ্ট্রিক গণ্ডী অনুযায়ী ভিন্ন প্রদেশ, তবু বাঙলার সীমান্ত-সংলগ্ন এক বৃহৎ ভূভাগ সর্বতোভাবে বাংলাদেশেরই অংশ। কিন্তু বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও কর্মচারীদের বিদ্বেষ প্রশমিত না হলে এসব জায়গাতে বাঙলার সংস্কৃতি আর কতদিন বেঁচে থাকবে সন্দেহের বিষয়। সর্বত্রই স্থানীয় গল্পগাথা ছড়া গান নিশ্চয়ই আপনা থেকেই অনেক জন্মেছে। স্থানীয় লোকে অবশ্যই তা জানে। দূরে আছি বলে আমরা তার খোঁজখবর না রাখতে পারি, কিন্তু তাই বলে তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানে এগুলির অস্তিত্ব গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন। কাজেই অবিলম্বে কোনো সাহিত্যোৎসাহী সাহিত্য-গবেষক এগুলিকে সংগ্রহ করে রাখবার চেষ্টা না করলে এই অমূল্য রত্নগুলি চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবার বিশেষ আশঙ্কা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বাঙালী জাতি সাহিত্য সম্বন্ধে অত্যন্ত নিরুৎসাহ। কেবল সাহিত্য সম্বন্ধেই বা বলি কেন, তার চরিত্রে উদ্যম জিনিসটারই অত্যন্ত অভাব। এ-পর্যন্ত কোনো বাঙালী এরূপ

লৌকিক সাহিত্য-সংগ্রহের চেষ্টায় তেমন ভাবে আত্মনিয়োগ করেন নি। সত্য বটে কিছু সংখ্যক কবি, সাহিত্যিক ও কাব্যোৎসাহী ব্যক্তি এরূপ জিনিস কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এ ধরণের সংগ্রহের চেষ্টাতেই সমস্ত উদ্যম সময় ও ধৈর্য নিয়োগ করা, এককথায় এই নিয়েই পড়ে থাকার মত মনোবৃত্তি খুব কম বাঙলী সাহিত্যিকেরই এ পর্যন্ত দেখা গেছে।

আজই না হয় দেশের এমন দুর্দিন এসেছে যে, অধিকাংশ সাহিত্যোৎসাহী যুবকের আর্থিক সঙ্গতি বা মনের অবস্থা এরূপ কাজে নামবার অনুকূল নয়। কিন্তু এমন দিন ছিল যখন বহু সাহিত্যোৎসাহী যুবকেরই হাতে পয়সা এবং সময়ের প্রাচুর্য ছিল। তা ছাড়া, আমাদের দেশের রাজা-মহারাজা জমিদারেরা সাহিত্যক্ষেত্রে কেউ-কেটারূপে পরিগণিত হবার আকাঙ্ক্ষায় ভাড়াটে সাহিত্যিক বা কাগজের পিছনে বহু অর্থব্যয় করেছেন এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। অথচ লৌকিক সাহিত্যের সংগ্রহ-প্রচেষ্টায় অর্থব্যয় করলে তাঁরা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী নাম রেখে যেতে পারতেন। রাজা-জমিদারের মধ্যে অনেকের অবস্থা ইদানিং পড়ে গিয়ে থাকলেও দেশে বড়লোকের অভাব নেই। নামের মোহ যে তাঁদের অনেকেরই প্রবল তারও বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে। এঁরা কেউ এখন এরূপ সংগ্রহ-প্রচেষ্টার ব্যয়-ভার বহনে অগ্রণী হলে কয়েকটি নবীন সাহিত্যিক কাজ পেয়ে বাঁচে এবং সাহিত্য আর দেশের যথেষ্ট উপকার হয়।

২২

বাংলার ঋতু ও ফুল

আজ দুপুরে হঠাৎ শুনতে পেলাম আমার পূবের জানালার কাছের গাছটাতে কোকিল ডাকছে। মনে হোল তাইতো! শ্রীপঞ্চমী চলে গেল, বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে মেয়েরা অঞ্জলি দিতে গেল বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে। বাসন্তী রঙের আঁচল উড়িয়ে ওরা যে প্রত্যাসন্ন বসন্তেরই অভিনন্দন জানালো তা তো লক্ষ্য করিনি। বাসন্তী বেশে যারা বসন্তের জয়পতাকা উড়িয়ে চলে গেল, তারাও হয়তো জানে না যে, বসন্ত ঋতু ক্ষণকালের আতিথ্য নিতে আমাদের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, এখনি তাকে চিনে মনের মধ্যে টেনে না নিলে সে আবার হারিয়ে যাবে।

এমনিই হয়। আমাদের বহুমুখী অভিনিবেশের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই এমন ছিদ্র থাকে না যেখান দিয়ে জীবনের শুভ মুহূর্তগুলি প্রবেশ করতে পারে। প্রকৃতির নিয়মিত ঋতুচক্রের প্রত্যেকটিই কোনোদিন হয়তো পুরোনো হয়ে বিস্বাদ হয়ে যায়, হয়তো বা তখন তারা বিরক্তিই উৎপাদন করে। কিন্তু প্রতেক ঋতুরই প্রথম স্পর্শ বড় মধুর। তাই শীতের পর যখন প্রথম দক্ষিণ থেকে ঈষত্নুষ্ণ হাওয়া বয়, যখন কোকিলের প্রথম ডাক কানে আসে, যখন দৈবাৎ পথের ধারে কোনো আমগাছের দিকে তাকিয়ে দেখা যায়, প্রচুর বউল আর কচিপাতার আভাসে সে গাছের এক নতুন রূপ উদ্ভাসিত হয়ে

উঠেছে, তখন মনের ভিতরকার মানুষটি জেগে উঠে বলে — 'বাঃ, কী সুন্দর পৃথিবী !'

প্রত্যেক ঋতুর আবির্ভাবেরই প্রথম অনুভূতি এমনি চেতনা জাগানো মাধুর্যে ভরপুর। নইলে কালিদাস আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের কথা বলতেন না — শুধু আষাঢ় বললেই চলতো। আর, যাঁরা 'আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে' পাঠ আবিষ্কার করে অভিনব ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের প্রতি মল্লিনাথ ঐরূপ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গও প্রয়োগ করতেন না। এই কারণেই নব-জলধরের এত স্তুতি, আর নবজলধরশ্যাম বর্ণের এমন তারিফ। নইলে নতুন মেঘ আর আর পুরোনো মেঘের রঙে যে বড় বেশি তফাৎ আছে তা নয়। কিন্তু নতুন মেঘের দিকে তাকালেই প্রাণে যে উল্লাস জন্মে, নবজলধর কথাটির সঙ্গে তা জড়িয়ে আছে বলেই শ্রীরামচন্দ্রকে নবজলধরশ্যামবর্ণ বলে বর্ণনা করা হয় ; আর সেইজন্যই উজ্জ্বল-গৌরবর্ণা শ্রীরাধিকা যখন সন্ধ্যার সময় ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তখনকার শোভা বর্ণনা করতে বিদ্যাপতি তুলনা দিয়ে বলেন, 'নবজলধরে বিজুরী-রেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি।'

বসন্ত শরৎ আর বর্ষার আবির্ভাব যেরূপ মাধুর্যময় শীতেরও তাই। কিন্তু শীতের কুণ্ঠিত, একবার এগুনো একবার পেছুনো আগমনকালকে আমরা হেমন্ত নামে চিহ্নিত করি বলে ভাদ্র-আশ্বিনের গুমোটের পর ঠাণ্ডা হাওয়ার গা-জুড়ানো স্পর্শ যে কত ভালো লাগে তা লেখক ও কবিরা হেমন্ত-বন্দনাতেই প্রকাশ করেন, শীতের নামোচ্চারণ করেন না। তেমনি, শীতের পর গ্রীষ্মের প্রথম অনুভূতিকে আমরা বসন্ত

বলেই বরণ করি, গ্রীষ্ম-বন্দনা কবিজনোচিত বলে গণ্য নয় — সম্ভবত লোভনীয় ফলের প্রাচুর্য গ্রীষ্মের জাত মেরেছে।

এটা আমারই একার অনুভূতি কিনা জানি না, কিন্তু ঋতুগুলির প্রথম আবির্ভাবের মোহ কখনই আমাকে ফাঁকি দিয়ে যেতে পারে না,— যদিও স্বীকার করি আমাদের দেশে ঋতুপতির দর্শন পাওয়া রাজদর্শনের মতই দুর্লভ সৌভাগ্য। কেননা, শীতের হাওয়ার কাঁপুনি থামতে না থামতেই হঠাৎ একদিন গরমে গা ভিজে ওঠে; ঠাণ্ডা জল আর পাখার হাওয়ার আরাধনা করতে করতে আমরা পরস্পরকে বাক্যালাপের ভূমিকা করে বলি —'হঠাৎ কী রকম গরমটা পড়েছে দেখেছেন?' কিন্তু শীত যখন বহির্গমনের দ্বারপ্রান্তে, আর গ্রীষ্ম যখন সম্মুখ দরজায় করাঘাত করছে, এমনি এক সময় — হঠাৎ একদিন কোকিলের ডাক শোনা যায়, বাতাস যেন অকস্মাৎ মাধুর্যের আমেজ আনে, গাছের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দেখা যায় কচি কচি পাতায় তাদের শীর্ষ রক্তাভ হয়ে উঠেছে। মনের মধ্যে একটা উষ্ণ স্পর্শ অভ্যাসগত জড়তাকে ভেঙে দিয়ে ঋতুপতি বসন্তের আবির্ভাব ঘোষণা করে।

নইলে বাংলাদেশে বসন্ত ঋতু আসে কি আসে না, প্রায় তো বোঝাই যায় না। শীতের যাওয়া আর গ্রীষ্মের আসার মধ্যে তার ক্ষণিক আবির্ভাব। শ্রীপঞ্চমীতে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা বসন্তের অভিনন্দন জানাই বাসন্তীভূষায়, আর দোল পূর্ণিমায় আনুষ্ঠানিকভাবে যখন বসন্তোৎসব পালন করি, তার আগেই বসন্ত কখন যে এসে পালিয়ে যায়, অনেক সময় আমরা জানতেও পারি না।

বাংলাদেশে বসন্তকাল কেবল ক্ষণস্থায়ী নয়, তার রূপ সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত রূপের চেয়ে অনেকটা অপ্রকট। বাংলাদেশের বসন্তের অস্পষ্ট মূর্তিকে কুমারসম্ভবের বসন্ত বর্ণনার সঙ্গে উপমিত করতে যাওয়া বৃথা। আর বসন্তের কুসুম শোভা? বাংলাদেশ এতই ফুলের দেশ, বারো মাস এতই ফুলে এর বাগান ও বন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে বসন্তের পুষ্পাগম কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে চোখে পড়ে না। তার চেয়ে বাঙালীর চোখে শরতের ফুলের বৈশিষ্ট্য বেশি। শহরে তো আজকাল শীতকালে বিদেশী ফুলের বহুল চর্চার ফলে গ্রীষ্মাগমের সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়বার মত দেশী কুসুমশোভা বরং কমেই আসতে থাকে। আর পথ চলতে চলতে কুসুম সৌরভে সচকিত হওয়ার ক্ষণিক সৌভাগ্য এখানে শুধু বর্ষাতেই আসে। বকুল, বেল, রজনীগন্ধা, হাস্নাহেনার চেয়ে চমক লাগানো গন্ধ আর কার?

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের ফুল সম্বন্ধে দু'একটি কথা মনে হচ্ছে। আমাদের যেগুলো নিজস্ব ফুল, আজকালকার নাগরিক জীবনে তাদের দেখা পাওয়াই দুর্লভ সৌভাগ্য। যেসব ছেলেরা শহরে জন্মে শহরেই বড় হয়ে উঠেছে, তাদের কাছে তো অনেক ফুলের নামই অপরিচিত। শহরে ইটকাঠের ফাঁকে কেউ একছিটে জমি পেলেই বিলিতি ফুলের চারা লাগায়। এসব ফুলের চাষে খরচা বেশি, তদ্বির-তদারক ঢের। তবু ডালিয়া, কসমস, এস্টর, ক্যানায় আমাদের মন মজেছে, দিশী ফুলে বাগান ভরানো নেহাৎ সেকেলে-পনা বলে মনে হয়।

এই ধরুন পল্লীগ্রামে যেসব ফুল অযত্নে রাশি রাশি ফোটে,

সে হচ্ছে বিচিত্র বর্ণের সন্ধ্যামণি বা কৃষ্ণকলি, শিউলি, জবা, টগর, চাঁপা, করবী, কদম্ব, বেল, যুঁই, বকুল, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, গাঁদা, সূর্যমুখী, অতসী, অপরাজিতা — বাঙলার ফুলের অন্ত নেই। শহুরে ছেলেরা বেল, যুঁই, রজনীগন্ধা, গাঁদা, পদ্ম ও গোলাপ চেনে, বাজারে এগুলো কিনতে পাওয়া যায় বলে। অন্যগুলো জানে সাহিত্য কিংবা প্রকৃতি পরিচয় থেকে। তাই কাব্যে যখন তারা পড়ে —

'সেদিন মালতী যুঁথী জাতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি,' কিংবা
'আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক কাঞ্চন করবী
সুরের বরণ মাল্যে সবারে বরিয়া নিল কবি।'

তখন ব্যাখ্যা করে তাদের বুঝিয়ে বলবার দরকার হয়, কোন্‌টা কী রকম ফুল। শিউলি, বকুল, যুঁই, রজনীগন্ধা, জবা ও গাঁদা প্রভৃতির মত নয়ন-মনোহর ফুল খুব কমই আছে। অপরাজিতা, জবা, গাঁদা, চাঁপা প্রভৃতির বর্ণের ঔজ্জ্বল্য তুলনাহীন। অথচ কলকাতায় পঞ্চমুখী জবার গাছ বিশেষ দেখেছি মনে পড়ে না। কৃষ্ণচূড়া রাস্তার আশেপাশে দেখা যায় বলে পরিচিত, কিন্তু কদম, পলাশ ও বকুল গাছের নামগুলোই মাত্র শহুরে ছেলেদের শোনা থাকে। এক্ষেত্রে অধুনা কাব্যে কুসুমশোভার উল্লেখ বা বর্ণনা যে বর্জিত হয়েছে — এ এক হিসেবে ভালোই। এটা নিশ্চয় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, আজকাল কাব্যে প্রাকৃতিক শোভা বা কুসুমের বর্ণনা অতি সাবধানে এড়িয়ে যাওয়া হয়। কেননা কবি-জনোচিত কুসুম-মোহ কবিতায় প্রকাশ পেলে সে কাব্য 'রোমান্টিক'

এই অতি বিদ্রূপাত্মক বিশেষণ দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় আছে। ভেবে দেখুন সাম্প্রতিক সাহিত্যে কে ক'টা প্রকৃতি-বর্ণনা পাঠ করেছেন? অথচ প্রকৃতির বর্ণনা হলেই যে নেহাৎ সেকেলে কিছু হতে হবে তার কোনো মানে নেই। বোঝা যায়, আজকালকার কবি-সাহিত্যিকেরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ ও আনন্দের স্রোতস্বিনী পার হয়ে বিদ্যা-গ্রাহ্য গুরুতর তত্ত্বে উত্তীর্ণ হতে চাইছেন।

আমার বাল্যকালে যে কখানা শিশুপাঠ্য পুস্তক হাতে পাই, তার মধ্যে ছিল একখানা বাঁধানো ছোটদের মাসিক পত্রিকা, নাম 'প্রকৃতি'। বইখানির মধ্যে একটি দীর্ঘ কবিতা ছিল — বসন্ত ও গ্রীষ্মের তুলনামূলক আলোচনা। তাতে কবি গ্রীষ্মের অতি লোভনীয় চিত্র এঁকে প্রমাণ করেছিলেন যে, লোকে বাস্তববোধবর্জিত কবিদের ধুয়া ধরে যাই বলুক, গ্রীষ্মকাল সর্বাংশেই বসন্তের চেয়ে ভালো। উভয় ঋতুর তুলনায় কবি বলেছিলেন —

'প্রথম ধর আমের কথা মর্ত্যে সুধাফল,
যার কথাটি মনে হলেই জিবে আসে জল।
এমন জিনিস বসন্ত কি
দিতে পারে বল দেখি
আমটি ফেলে গোলাপ ফুলে নেবে কোন্ পাগল?'

এর পর লিচু, জাম, জামরুল, কাঁঠাল প্রভৃতি যাবতীয় রসনা-প্রলুব্ধকারী ফলের নাম উল্লেখ করে উপসংহারে কবি বলেছিলেন —

'গ্রীষ্মঋতু আমি তোমার পদানত দাস,
বসন্তকে চাই না, তুমি থাক বারোমাস।
গলায় দিলে ফুলের মালা
যাবে না তো পেটের জ্বালা
তোমার ফলে মুখ জুড়ালে মিটবে মনের আশ।'

রবীন্দ্রনাথ 'পুরস্কার' কবিতায় যে বাস্তব-বোধবর্জিত কবির কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যে 'মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো' হওয়া সত্ত্বেও রাজাকে সন্তুষ্ট করে 'প্রিয়ার কণ্ঠে দেবার মতন রাজকণ্ঠের মালা' নিয়ে ফিরেছিল, স্পষ্টতই তার সঙ্গে আমাদের এই কবির প্রভেদ বিস্তর।

লোকের ধারণা যাই হোক, কবিরা যে গ্রীষ্মের ফলসম্ভারের স্বাদ-গ্রহণে উদাসীন বা বিরূপ এমন প্রমাণ নেই। বস্তুত খাদ্যাখাদ্য বিচার তাঁদের বিলক্ষণ আছে এবং উপাদেয় খাদ্যের প্রতি তাঁদের বিন্দুমাত্র বিরূপতা নেই। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন কবিদের —

'বুদ্ধি যেন একটু থাকে
স্নানাহারের নিয়ম রাখে।'

সেটাকে স্বজাতি-সমর্থনের খাতিরে কবির অতি-ভাষণ বলে মনে করা চলে না। ভালো ভালো কবিরা উৎসাহ সহকারে ভালো ভালো আহার্যের বর্ণনা বা প্রশস্তি না করেছেন এমন নয়। কিন্তু কবিতার দরবারে ফুল এমনই একচেটিয়া মৌরসী আসন করে নিয়েছে যে, স্বাদু আহার্যেরা সেখানে গিয়ে ঢুকলেও সভাসদের আসন পায় না, তাদের থাকতে হয় বিদূষক হয়ে। তা না হলে, কী আশ্চর্য, ফুলের

উল্লেখ ও বর্ণনা কাব্যে বেশ মানিয়ে যায়, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের কথা বললেই সেটা হাসির কবিতা হয়ে দাঁড়ায়। মূর্ছা ও অশ্রুবিলাসী ভবভূতি তাঁর উত্তর-রামচরিতের বিষ্কম্ভকে যেটুকু হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন, তা রাজর্ষির আগমন উপলক্ষে মুনিদের খাওয়া নিয়ে। বস্তুত এই খাদ্যসংকটের দিনেও এবং বিকল্প আহার্যের প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন সত্ত্বেও, বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর তালিকা সন্নিবিষ্ট হলেই যে কবিতা উঁচুদরের হয়ে উঠবে এ সম্ভাবনা বিরল

কাজেই যে যাই বলুক, কবিতার সেকেলে উপকরণগুলোই কবিতার পক্ষে যথেষ্ট ভালো। সেকেলে কাব্যের উপকরণ ছিল চাঁদের আলো, মৃদুমন্দ হাওয়া, নীল আকাশ এবং ফুল — এনতার ফুল। যদি চাঁদের আলোর বদলে বর্ষার ঘনঘটা থাকতো, তবু ছিল কেতকী, যূথী, কদম্ব। যদি বসন্তের বদলে শরৎ দেখা দিতো, তবু ছিল কাশকুসুম ও শেফালিকা। যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো পরিবেশে কবির মানসিক অবস্থার অনুরূপ ফুলের কখনো কোনো অভাব হয়নি। এখন সেটাকে বর্জন করার কোনো প্রয়োজন বুঝি না। ফুল যখন এখনো ফুটছে এবং আমাদের ভালোও লাগছে, তখন কাব্যে কুসুম-বর্ণনাকে গ্রহণ করতে বাধা কী ?

২৩

প্রকৃতি ও নির্জনতা

আমার জানালা দিয়ে একটুকরো মাঠ দেখা যায়। মাঠের যেটুকু চোখে পড়ে তারি মধ্যে গুটি আষ্টেক গাছ ঘন সবুজের পাগড়ি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। পত্রপুঞ্জের নিচে সবুজ ঘাসের উপর লম্বা লম্বা ধূসর বৃক্ষকাণ্ড, যেন সবুজ গালিচার উপর ধূসর স্তম্ভে ঝোলানো সবুজ চন্দ্রাতপ।

আমার বাড়ির সামনে থেকে সেই মাঠ পর্যন্ত রাস্তা চলে গেছে, তারপর মাঠের দু' পাশে ছড়িয়ে পড়েছে। চারিদিকে বাড়ির ভিড়। এই ছোট রাস্তাটুকুর মধ্যে চলে অগণিত লোকযাত্রা। তারা চলতে চলতে হঠাৎ ডাইনে কি বাঁয়ে মোড় ফিরে দৃষ্টির অন্তরালে হারিয়ে যায়, অথবা অকস্মাৎ এদিক ওদিক থেকে চোখের সামনে এসে পড়ে — ঠিক যেন চেশায়ার বেড়াল। বেশ লাগে দেখতে। আমি রুগ্ন মানুষ। প্রায়ই অসুস্থ থাকি। রোগের প্রভাবে আর কিছুই যখন ভালো লাগে না, তখন এই রাস্তায় চলমান লোকগুলি আর তার পিছনের গাছপাতায় ভরা মাঠটার দিকে তাকিয়ে বেশ সময় কাটে। শূন্য মনের চমৎকার খোরাক জুটে যায়।

ভেবে দেখেছি, ঐ মাঠের সঙ্গে সঙ্গে সামনের ছোট্ট রাস্তাটুকুও যদি চোখে না পড়তো তাহলে বোধ হয় মনটাকে ওই দৃশ্যের মধ্যে অমন করে ডুবিয়ে দেওয়া শক্ত হোত। রাস্তাটুকুতে কখনো

মোটা কখনো রোগা লোক, কখনো দলবাঁধা তরুণী, কখনো সস্বামী গৃহিণী, কখনো বই বগলে ইস্কুলের ছেলেমেয়ে, কখনো বা আপিসের দেরি-হয়ে-যাওয়া দ্রুতগামী কেরানি, কখনো বাজারের থলে হাতে বিরক্তভঙ্গী কর্তামশাই আবার কখনো বা তানপুরো-সেতার-এস্রাজ হাতে সঙ্গীত-শিক্ষার্থিনী, এইরূপ নানা বিচিত্র লোকের যাতায়াত দেখতে পাই। রোজই হয়তো একই লোক এ রাস্তায় চলাফেরা করে, কিন্তু রোজই আসে তারা পুরোনো বেশ পুরোনো ভঙ্গির খোলস ছেড়ে নতুন হয়ে। কোনোদিনই তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কাটাতে খারাপ লাগে না।

এইখানেই মানুষে আর প্রকৃতিতে তফাৎ। এইজন্যই প্রকৃতির যত মোহ, যত আকর্ষণ সবই পশ্চাৎপট হিসেবে। অবশ্য বৃহত্তর অর্থে মানুষও প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত। কিন্তু প্রকৃতি বলতেই সহজে জড়প্রকৃতির কথাই আমাদের মনে আসে। সে প্রকৃতি বিচিত্র সুন্দর অপরূপ বটে, তবু তার সামনে পাদ-প্রদীপের সমস্ত আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে মানুষ রঙ্গমঞ্চের প্রধান স্থান অধিকার করে আছে বলেই জড়প্রকৃতির এত মোহ এত স্তুতি। সেইজন্যই কবিরা যখন প্রকৃতির কথা বলেন তখন সে উক্তিতে মানব-প্রেমেরও কিছু ইঙ্গিত আসে।

বিচিত্ররূপী মানবের পশ্চাৎপট হিসাবে প্রকৃতির গভীর সৌন্দর্য ও অসীম মূল্য হৃদয়ংগম করাই আসল। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে রাখতে পারা একটা বড় কৃতিত্ব এবং সাহিত্য-সাধনার এক বৃহৎ সহায়। বস্তুত মনটাকে মাঝে মাঝে নির্জন পরিবেশে

প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অবগাহন করিয়ে নিতে না পারলে সে-মন থেকে সহজে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বিশেষত কাব্য-সাহিত্য উৎসারিত হতে চায় না।

সমসাময়িক সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে যে, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কৃতী ও বিখ্যাত সাহিত্যিকদের যোগাযোগ যেন বড়ই কম। নইলে সাহিত্য রচনার এঁরা এত অনবসর কেন? একটা লেখা শেষ করার আগেই এঁরা আরেক লেখার পরিকল্পনা করেন। ভূতে পাওয়া তাড়ায় এঁদের অনেকেরই লেখনী ছুটে চলে উর্ধ্বশ্বাসে। এই জন্যই এঁদের লেখা পড়ে অনেক সময় মনে হয় যে, রচনার বিষয়টি যেমন topical ও তুচ্ছ, এবং রচনা-ভঙ্গী অবিন্যস্ত।

সাহিত্য রচনায় মনটাকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সন্নিবিষ্ট করা সহজ নয়। এক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট মন অন্য বিষয়ে তৎক্ষণাৎ গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হবে কি করে যদি তাকে বিশ্রাম না দেওয়া যায়? অভিনিবেশ জিনিসটা হচ্ছে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকার মত। আলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অন্য দিকে তাকালে যেমন ঝাপসা দেখা যায়, আজ-কালকার অনেক লেখাতেই তেমনি ঝাপসা দেখার পরিচয় পাই।

মন হচ্ছে মহাশয়, সে হচ্ছে রাজা। তাকে সন্তুষ্ট তৃপ্ত প্রসন্ন না রাখতে পারলে কিছুই পাওয়া যায় না, কোনো কীর্তিই গড়া যায় না, কোনো রচনাই সুষ্ঠু হয় না। মনকে তাই মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিতে হয়, তার মেজাজ বুঝে তাকে তোয়াজ করতে হয়। হাজার

হলেও মন কিম্বা কলম কোনোটাই তো আর রেল-ইঞ্জিনের চাকা নয় যে যত জোরে চলবে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুনো ততই সহজ হয়ে উঠবে !

তবে এ প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে সাহিত্যিকেরা সর্বদাই নির্জনে মানব সমাজ ও তার সাধারণ পরিবেশ থেকে দূরে সরে থেকে সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন থাকবে এটাও অন্যায় আবদার।

ভাবপ্রবণ লোকদের সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে বটে যে, তাঁরা নির্জনতার ভক্ত, সাংসারিক পারিবারিক বা নাগরিক কোলাহল তাঁরা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না এবং নির্জন নদীতীরে, চিলেকোঠার ঘরে কিংবা জনবিরল পথে-ঘাটে সময় কাটাতেই তাঁরা ভালোবাসেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' কথাটির মধ্যে যতখানি সত্য ছিল, এই প্রসিদ্ধির মূলে ততোধিক সত্য নেই। স্বাভাবিক মানুষ যতই ভাবপ্রবণ বা কল্পনাবিলাসী হোক না কেন, মানবসঙ্গের চেয়ে প্রিয় তার কাছে কিছুই থাকতে পারে না। ভাব কল্পনা ও চিন্তার উপর রবীন্দ্রনাথের মত অধিকার আর কার ছিল ? কিন্তু তিনিও মনোমত সঙ্গী পেলে আড্ডা দিতে কম ভালোবাসতেন না। তা যদি না হবে তাহলে

'পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়
কাজ কর্ম কর সায় এসো চটপট,
শামলা আঁটিয়া নিত্য তুমি কর ডেপুটিত্ব
একা পড়ে মোর চিত্ত করে ছটফট।'

বলে তিনি বন্ধুকে জরুরি আহ্বান জানাবেন কেন ?

মানুষের যা কিছু অনুরাগ তা যেমন প্রধানত মানুষকে ঘিরে,

তার বিরাগের লক্ষ্যও তেমনি মানুষই। কাউকে পছন্দ করতে যত ভালো লাগে, কাউকে অপছন্দ করাও তার চেয়ে কম রুচিকর নয়। পাড়াপড়শির সঙ্গে আলাপ করাতেও লোকের যেমন আগ্রহ, আড়ালে তাদের নিন্দে করাতেও তার উৎসাহ সেইরূপ প্রবল। মিষ্টি কথা বলে কিম্বা প্রেম নিবেদন করে যেমন তৃপ্তি, উপযুক্ত পাত্রে মনের মত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে পারলেও সুখটা তার চেয়ে বিশেষ কম হয় না। ঝগড়া করে করে তৃপ্তি হোত না বলেই সেকেলে গিন্নিরা ঝগড়াকে ধামাচাপা দিয়ে রেখে দিতো। জিরিয়ে জিরিয়ে ঝগড়া করতো অবসর বুঝে। কিন্তু আজকাল আর সে-জাতীয় কলহের রেওয়াজ নেই। গদাযুদ্ধ বড়ই সেকেলে, আজকাল সূক্ষ্মতর অস্ত্রেই যুদ্ধ চলে।

এরূপ ক্ষেত্রে অনুরাগ ও বিরাগ বর্জিত সম্পূর্ণ উদাসীন মানুষ ছাড়া কাউকেই নির্জনতার ঐকান্তিক ভক্ত বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। তবু নির্জনতা আমরা ভালোবাসি বৈকি। লোকের সঙ্গে মেলামেশার পর, কাজকর্মের শেষে, প্রেম ও প্রীতিতে ব্যর্থতা বা সার্থকতার পর, আমরা অধিকাংশ লোকই নিরালায় থাকতে চাই, বিজন পরিবেশ খুঁজি। মানুষকে আমরা এত ভালো-বাসি বলেই তো তার কাছ থেকে মাঝে মাঝে পালিয়ে আসতে হয়, দূর থেকে তাকে ভালো করে দেখবার জন্য। নির্জনে যখন থাকি, তখন তো আমরা শুধু ভাবতেই পারি, আর তো আমাদের কিছু করবার থাকে না। আর, তখন আমরা অন্য মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, দেনা-পাওনা কিংবা ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ছাড়া আর কীই

বা ভাবতে পারি ? কেউ প্রেমাস্পদ-প্রেমাস্পদার ধ্যান করে, কেউ আপিসের বড়বাবু ও বড় সাহেবের কথা ভাবে, আর কেউ বা প্রফেসার মহেশ মিত্তিরের মত মনে মনে সহকর্মী হরিনাথ কুণ্ডুর মুণ্ডুপাত করে ।

কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের বিশেষ করে নির্জনতা খুঁজে বেড়াতে হয় চোখের দেখা মানুষগুলোকে মনের দেখা দেখবার জন্য। সেই দেখা না দেখলে তাদের নিয়ে সৃষ্টি হয় না, আঁকা যায় না তাদের স্পষ্ট করে। মনের দেখা থেকেই তো আসে বর্ণনা উপমা স্তুতি। প্রিয়ার চোখের সঙ্গে হরিণ আঁখির সাদৃশ্য তো মানুষ মনশ্চক্ষেই দেখেছে। কিন্তু মন দিয়ে দেখা যায় না চোখের আড়াল না হলে। কেবল চোখই বা কেন, মানবের বহিপ্র্রকৃতির সঙ্গে অন্তপ্র্রকৃতির এমনই অদ্ভুত সম্পর্ক যে, বাইরের ইন্দ্রিয় বিশ্রাম না নিলে মনের ইন্দ্রিয় জাগে না। বাইরের দেখা, বাইরের শোনা, বাইরের পাওয়া না ফুরোলো মনের দেখা মনের শোনা মনের পাওয়া শুরু হয় না। তাই ইহলোকে যাঁদের কিছুই পাওয়ার নেই, তাঁদের পরলোকের সাধনা হয় নির্জনে, পর্বত-গুহায়, অরণ্যে।

সেই জন্য শিল্পস্রষ্টারা মাঝে মাঝেই জনকোলাহল থেকে একটু গা ঢাকা দিতে পছন্দ করেন। সেই নির্জনতায় তাঁরা বাইরের দেখা বাইরের জানা জগৎকে মন দিয়ে দেখেশুনে বুঝে নিতে চান। এই দেখে যদি কেউ বলেন যে জনসংসর্গের চেয়ে নির্জনতাই তাঁরা বেশি পছন্দ করেন তাহলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে।

২৪

মানুষের চেহারা

রাস্তায়-ঘাটে এখানে-ওখানে হঠাৎ এক একখানি মুখ চোখে পড়ে, যা আর একবার তাকিয়ে দেখতে হয়। নিরন্তর পথ চলতে, ট্রামে-বাসে, সিনেমা-তামাসায় মানুষ তো নিত্যই আমরা কম দেখি না। কিন্তু দিনের শেষে বাড়ি ফিরে, পরিচিত দু' একটি চেহারা ছাড়া পথে-দেখা হাজার হাজার মুখের মধ্যে একটাও কি মনে করা যায়? হয়তো একই ট্রামে পাশাপাশি বসে আপিস যাবার সময় রাষ্ট্রীয় ত্রুটির সমালোচনায় কারো সঙ্গে একই যোগে মুখর হয়ে থাকবো, হয়তো ট্রামের জন্য অপেক্ষমান হয়ে দশ মিনিট ধরে অপর কারুর সঙ্গে যানবাহনের অসুবিধা সম্বন্ধে তারস্বরে আলোচনাও করেছি, কিন্তু তাদের কারুর চেহারাই ঘুণাক্ষরে মনে আসে না। আবার এমনও হয় যে, একটি লোক রাস্তার বিপরীত দিক থেকে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিগোচর হয়েই পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তার মুখখানা কিন্তু ফিরে আর একবার দেখতে কৌতূহল জাগে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত চেহারাটি মনে আঁকা থাকে। নারীসৌন্দর্য যে চোখকে এত আকর্ষণ করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পর্যন্ত মনে কোনো রেখাপাত করে না। একটু পরেই সে সব মুখ আর মনে আসে না। এমন কি, গতানুগতিক বিচারে যে সব মেয়ে হয়তো সুন্দরী বলে পরিগণিত, তাদের চেহারাও তখন-তখন দু' একবার তাকিয়ে দেখবার পরই মন থেকে মুছে যায়।

আবার হয়তো একটি কালো মেয়ের চোখ দুটি মনের মধ্যে এমনি বর্ণবিন্যাস করে দিয়ে যায় যে সে-চেহারা কেবলি স্মৃতিতে ঘোরাফেরা করে। তাকে এড়ানো সহজ নয়।

চৈনিক লেখক লিন্ য়ু টাঙ্-এর মতে চেহারার আকর্ষণ একমাত্র বই পড়া দ্বারাই হওয়া সম্ভব। তিনি পূর্ববর্তী চীন-কবি হুয়াঙ্ শাংকুর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, 'যে শিক্ষিত ব্যক্তি তিন দিন কিছু পড়েনি, তার আলাপে কোনো স্বাদ থাকে না, আর তার নিজের চেহারার দিকে তাকাতেও ঘৃণাবোধ হয়।' শ্রীযুক্ত লিন্ পৃথিবীর একটি সুন্দরতম চেহারার দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বর্গীয় জি কে চেস্টারটনের উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ উক্তির মধ্যে খানিকটা সত্য আছে সন্দেহ নেই। বই পড়াতে লোকের চেহারায় একটা দীপ্তি আসে একথা ঠিক, কিন্তু সে-দীপ্তি বা আভা অন্য বহুবিধভাবেও আসতে পারে। মনের মধ্যে যখনই ভাব, ভাবনা, চিন্তা প্রভৃতি প্রবাহিত হয়, তখনই সে-প্রবাহের কম্পন ফুটে ওঠে মুখে চোখে; তখন আর চেহারা নির্জীব ও অচল থাকে না, জীবন্ত ও সচল হয়ে দাঁড়ায়। মন যখন নিষ্ক্রিয়, চেহারাও তখন জড় ও অচেতন, তার মধ্যে আকর্ষণ কিছু নেই। কিন্তু মন যখন চিন্তা ও ভাবের চলোর্মিতে চঞ্চল, চেহারাও তখন পরিবর্তমান ভাবাবেগের আভায় উদ্ভাসিত। বস্তুত গতিশীলতাই চোখে মুখে রূপ দান করে এবং চেহারাকে দ্রষ্টব্য ও আকর্ষণীয় করে তোলে। আকাশে যখন সঞ্চরমান মেঘে মেঘে বিচিত্র ছবি ভেসে উঠতে থাকে, তখন বহুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়। কিন্তু আকাশ যখন পরিষ্কার, তখন আর তা বিশেষ-

ভাবে দ্রষ্টব্য নয়। এইজন্যই দিনের আকাশের চেয়ে রাত্রির আকাশের মোহ বেশি ; কেননা, সেখানে কম্পমান্ তারায় তারায় জীবন্ত সৌন্দর্য উদ্ভাসিত। লোকে বহু কষ্ট করে তুষারাবৃত পর্বত চূড়ায় সূর্যোদয়ের শোভা দেখতে যায়, কারণ সেখানে পরিস্ফুট হয় গতিশীল পরিবর্তমান্ বর্ণের অপরূপ লীলা। ডোবার ধারে বসে জলের সৌন্দর্য দেখা যায় না, কিন্তু স্টীমার যখন পদ্মার ঢেউ কেটে অগ্রসর হতে থাকে, তখন ডেকের সামনে দাঁড়িয়ে উদ্দাম জলস্রোত দেখা এক অপূর্ব উপভোগ। আমি বহুবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে এই অপরূপ শোভা দেখেছি, তবুও যেন দেখে দেখে তৃপ্তি হয়নি।

মানুষের চেহারার বেলাতেও তাই। অচেতনপ্রায় শূন্য চেহারার কোনো দাম নেই — কোনো আকর্ষণই তার চোখে পড়ে না। বুদ্ধির দীপ্তির কথা আমরা প্রায়শই বলি ও শুনি। বুদ্ধি মানুষকে চিন্তা-প্রবণ করে বলেই তার রূপ আমরা চোখে-মুখে দেখতে পাই। বুদ্ধি যখন সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন বুদ্ধিমান লোকের চেহারাও একটু ক্যাব্‌লা-ক্যাব্‌লা মনে হয়, আকর্ষণ তার অনেকখানিই হারিয়ে যায়।

এ কারণে আমার মতে পৃথিবীতে দ্রষ্টব্য চেহারা মানুষের তখনই হয়, যখন মানুষের মুখ চোখ প্রেরণায় সমুজ্জ্বল হয় অথবা উদ্দাম ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত মনকে প্রতিফলিত করে। একাগ্র ও ভাব-নিমগ্ন সাহিত্য বা শিল্পসাধকের চেয়ে সুন্দর আর কে আছে? রবীন্দ্র-নাথের চেয়ে সুন্দর মানুষ কে কোথায় দেখেছেন? সাহিত্যিক, চিত্র-

শিল্পী, সঙ্গীতবিদকে একটু চোখের দেখা দেখবার জন্যই মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়, আর তাঁদের সাহচর্য পেলে নিজেদের ধন্য মনে করে। কেবল শিল্পস্রষ্টাই নয়, ভাবাবেগ যখন যার মুখে ফোটে, তখন তার চেহারাই উজ্জ্বল বা সুন্দর মনে হয়। প্রেমে পড়লে কিংবা নতুন বিয়ের পর ছেলেমেয়েদের চোখে যে একটা ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তা কে না লক্ষ্য করেছেন? লোকে যখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় তখন তার চেহারাটি বেশ দর্শনীয় হতে পারে — যদি অবশ্য দর্শক সে-ক্রোধের লক্ষ্য না হয়। এইজন্য অনেকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খেপিয়ে মজা দেখতে ভালবাসে। বস্তুত লোককে খেপানো এবং চটানোর মজাটাই এইখানে। চিত্রশিল্পীরাও যে ভক্তিতে তদ্‌গত, প্রেমে আকুল অথবা বিষাদে মগ্ন নরনারীর চেহারাই আঁকেন তার কারণ আবেগময় না হ'লে সে চেহারা দেখেই বা লাভ কী, দেখিয়েই বা লাভ কী?

সাধারণ অবস্থায় মানুষের চেহারার নৈরাশ্যজনক জড়তা ও একঘেয়েমি লক্ষ্য করেন বলেই সম্ভবত অনেক শিল্পী নিরালায় জীবনযাপন পছন্দ করেন এবং নিজের পরিচিত ও প্রিয়জনের গণ্ডির বাইরে বড় একটা মিশতে চান না। প্রকৃতিভক্ত কবিরা প্রকৃতির মধ্যে যে বিচিত্র রূপলীলা দেখে গেছেন, তা হয়তো বিভিন্ন ধরণের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ বা প্রবৃত্তির অভাবে তাঁরা মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করেন নি। নতুবা প্রকৃতি যতই সুন্দর ও বিচিত্র, হৃদয়-মনোহর ও আকর্ষণীয় হোক না কেন, তার কোনো তুলনাই হতে পারে না মানবের বিচিত্র-

তর চেহারা ও তার জীবনের মোহময় আকর্ষণের সঙ্গে। প্রকৃতি অপরূপ, প্রকৃতি শান্তিময়, প্রকৃতি বিচিত্ররূপা ও বহু প্রেরণার উৎস। কিন্তু তবুও প্রকৃতি মানব-মনের পশ্চাৎপট মাত্র। Full many a flower born to blush unseen সম্বন্ধে কবির উচ্ছ্বাসে আমার কোনো সায় নেই। মণিমাণিক্যই বলুন আর ফুলই বলুন, মানুষ তাকে নিজের সৌন্দর্যবোধ চরিতার্থ করবার উপকরণ বলে মনে করে বলেই তার মূল্য। নইলে, সৌন্দর্য-পিপাসু চোখ ও মন দিয়ে না দেখলে, কালো পাথর আর সাদা পাথরে তফাৎ কী? কী পার্থক্য হীরে আর কয়লায়? তেমনি ভেবে দেখুন, যাঁরা জরিপের কাজে বিভিন্ন বিচিত্র ক্ষেতে মাঠে নদীতটে ফিতে আর কুলি নিয়ে ঘুরে বেড়ান, তার মধ্যে ক'জন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে দেখেন কিংবা সে সৌন্দর্যের পরোয়া করেন? অথচ তাঁরাই লক্ষ্য করলে হয়তো দেখতে পেতেন অন্তরঙ্গতম পরিবেশে প্রকৃতির রূপ-লীলা। দুঃখের বিষয় সরকারী বনবিভাগ, জরিপ ও অন্যান্য তজ্জাতীয় বিভাগে সঞ্জীবচন্দ্রের মত দৃষ্টিবান ও মনবান ব্যক্তি অতি বিরল। ফলে যে সব প্রাকৃতিক দৃশ্য শুধু মাত্র ছবি ও কল্পনার মধ্য দিয়ে এসেই আমাদের মনকে নিরুদ্দেশের যাত্রায় বারবার আকর্ষণ করে, সে সব দৃশ্যের সম্মুখীন হয়েও অনেকেরই কাছে তা মূল্য ও অর্থহীন।

কিন্তু দূর হোকগে প্রকৃতি-পরিচয়। জড়প্রকৃতির কথা আমি বলতে বসিনি। আমি বলছিলাম, মানুষের চিত্ত যখন স্থির বা স্থবির, তখন তার মুখও হয় জড় এবং কৌতূহলবর্জিত। আর যে হেতু অধিকাংশ মানুষের মুখ অধিকাংশ সময় ভাবলেশহীন, সে

কারণে পৃথিবীর জনারণ্য অধিকাংশ সময়ই অন্ধকার ও বৈচিত্র্যহীন বলে মনে না হয়ে পারে না। এ ক্ষেত্রে যখনই আমরা অন্য লোকের সংস্পর্শে আসি, তখনই সুযোগ পেলেই, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে হৃদয়ে হৃদয়ে কিংবা মনে মনে চক্‌মকি ঠুকে আলো জ্বালাবার চেষ্টা করা। অবশ্য এমন অনেক লোকের সংস্পর্শেও আমাদের অহরহ আসতে হয় যাদের মন চক্‌মকি পাথর নয়, এমন কি সমিধ্‌ও নয় যে ইচ্ছে করলেই তাতে বা তার থেকে আলো জ্বালা চলে। মাটির ঢেলাতে পাথর ঠুকে লাভ নেই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, মনবান্ প্রত্যেক মানুষই কোনো এক অজ্ঞাত আকর্ষণে এমন সব লোকের সঙ্গেই এসে জুটে যায়, যাদের প্রত্যেকেরই মন আলো দিতে ও আলো নিতে জানে। তাই যখন কয়েকজন সাহিত্যিক ও শিল্পী, কিংবা কয়েকটি রসগ্রাহী বিদগ্ধ ব্যক্তি পরস্পর মিলিত হন, তখন স্বভাবতই আলাপটা কেবল পারস্পারিক কুশল প্রশ্ন, জীবনধারণের দুঃখ অথবা মৎস্য-মাংসাদির দুর্মূল্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এ সব কথাও হয়তো হয়, এবং রসিকতা, বিদ্রূপ, পরনিন্দা ও পরচর্চা, অকথ্য-কুকথ্য ভাষণেও হয়তো বাধা থাকে না। কিন্তু সে সবই হচ্ছে খরস্রোতস্বিনীতে ভেসে আসা কাঠ-কুটো ফুল-পাতার মত। আসলে মন থেকে মনে, বুদ্ধি থেকে বোধে, উপলব্ধির থেকে রসানুভূতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে তীর বেগে ছুটে যায় ভাব, ভাবনা ও প্রেরণার নদী। মনে মনে এই আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক শিল্পী ও বিদগ্ধজন তাঁদের মনের প্রদীপ জ্বালেন। এই আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই বৃহত্তর কল্পনা ও সৃষ্টির সিঁড়ি তৈরি

হয়। আর এই অন্তরঙ্গ দেওয়া-নেওয়ার থেকে তাঁদের মুখে-চোখে আসে দীপ্তি, যা পৃথিবীর অন্ধকার জনারণ্যে সত্যোপলব্ধির পথ দেখায়।

আমার অনতিসংক্ষিপ্ত জীবনে এমন অনেক সাহিত্যিক, শিল্পী ও বিদগ্ধজন দেখেছি যাঁরা সামাজিক, পারিবারিক ও শত্রু মহলে কুনো ও মুখচোরা বলে নিন্দিত। কিন্তু মনের মত বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যে এঁদের অনর্গল গলাবাজি এক তাজ্জব ব্যাপার। কয়েকটি নিরীহ গোবেচারা মুখচোরা সাহিত্যিক যখন সবাই মিলে একযোগে তারস্বরে বাক্যালাপ করেন, তখন পাশের বাড়ি থেকে নালিশ আসে এমন ব্যাপারও প্রত্যক্ষ করেছি। মনবানদের এই আলাপ হচ্ছে তাঁদের মনের ব্যায়াম। কয়েকদিন ধরে মনের মত লোকের সঙ্গে আড্ডা দিতে না পারলেই সাহিত্যিক ও তজ্জাতীয় লোকেরা মুষড়ে পড়েন। তাঁদের মন নির্জীব হয়ে পড়তে চায়, সময় গুরুভার হয়ে ওঠে এবং চেহারা খারাপ হয়ে যায়। এর একমাত্র প্রতিকার বই পড়া। সেখানেও একজন অদৃশ্য কথকের সঙ্গে আলাপচারীর সুযোগ আছে। কিন্তু সে আলাপ চলে শুধু একজনের সঙ্গে। একই ধারায় প্রবাহিত ভাবনা ও বক্তব্যের সঙ্গে মনের খেলায় আনন্দ ও তৃপ্তি থাকতে পারে ; কিন্তু যাই বলুন পাঁচদিক থেকে পাঁচজন বন্ধু যখন একযোগে বিভিন্ন বিচিত্র চিন্তা ও বক্তব্যের ঢেউ তুলতে থাকে, তখন সে উদ্বেল ভাবোচ্ছ্বাসে অবগাহন করে অভিভূত হয়ে যাওয়ার যে মজা, তার কি কোনো তুলনা আছে ?

২৫

আমরা আর ওঁরা

এমিয়েল সাহেবের Journal Intime গ্রন্থে তাঁর এক বান্ধবীর কথা লিপিবদ্ধ আছে, যিনি 'does not see the ugliness of people when once she is interested in them. She likes and dislikes, and those she likes are beautiful, those she dislikes are ugly'। এমিয়েল সাহেব বলেছেন যে, তিনি এইরূপ মানসিক সম্পর্কের দ্বারা লোকের চেহারা বিচারে অক্ষম ছিলেন। যে-কোনোরূপ আবয়বিক ত্রুটি তাঁকে পীড়িত করতো এবং নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব দেখলে তিনি অত্যন্তই ব্যথিত হতেন।

এমিয়েল-বান্ধবী মহিলার মত একমাত্র ভালো-লাগা মন্দ-লাগার দ্বারা মানুষের রূপ বিচারের পদ্ধতিটা কিছু পরিমাণে আমরা সকলেই অনুসরণ করি এ বিষয়ে সন্দেহ কী? বিশেষত যে দেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অদৃষ্টপূর্ব মানব যুগল চিরকালের জন্য বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, আর যেখানে এই যোগাযোগ কালো কুৎসিৎ কানা খোঁড়া সকলের সঙ্গে ঘটা সম্ভব, সে দেশে 'এমনটি আর পড়িল না চোখে আমার যেমন আছে' বলে সকল অবস্থায়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করবার মত করেই মনকে তৈরি করতে হয়। ভালো সেখানে লাগিয়ে নিতে হয় এবং ভালো লাগা দিয়েই করতে হয় চেহারার বিচার।

পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা বা না লাগার ফলে সাধারণত লোকে অপরের খুঁত ধরে, আবার নানারূপ দোষ-ত্রুটি অনেক সময় উপেক্ষাও করে। চেহারার খুঁত যেমন অনেক সময় লক্ষ্য করতে ভুল হয়, চারিত্রিক ত্রুটিও তেমনি অনেক সময় চোখে পড়ে না। কিন্তু এইরূপ অন্ধতা সাধারণত পুরুষ মানুষের পক্ষে সাময়িকভাবেই আসে।

আমাদের পক্ষে এটা কল্পনা করাই অসম্ভব, যে স্নেহ ও প্রীতি-ভাজন সকল লোকই সর্বদা দেখতে সুন্দর বলে স্বীকার করে নিচ্ছি। আমরা, অর্থাৎ পুরুষ জাতি, অতিমাত্রায় যুক্তিবিলাসী। বিচার-প্রবণতা আমাদের মজ্জাগত। যা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করে না, তাকেও যেমন আমরা বিচার করতে প্রবৃত্ত হই, যা আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তাকেও একেবারে নির্বিচার তারিফে গ্রহণ করতে পারি না। ব্যক্তিতভাবে যারা অন্তরঙ্গ বন্ধু তাদের সব লেখাকেই কি বাহবা দিতে পারি? কোনো কোনো বন্ধুর লেখা যে আদপেই ভালো লাগে না এটা নিজের মনের কাছে অস্বীকার করি কী করে? কিন্তু এমন কোন্ মেয়ে আছেন যিনি স্বামীর রচনাকেই শ্রেষ্ঠ রচনা মনে না করেন?

আমরা যেমন যেটুকু দেখি সেটুকুতেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করি, তেমনি অধিকাংশ জিনিসই যে আমরা দেখি না কিম্বা লক্ষ্য করি না একথাও সত্য। মেয়েরা খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি জিনিস লক্ষ্য করে, কিন্তু একমাত্র পছন্দ-অপছন্দের দ্বারাই তাকে যাচাই করে নেয়। কোনো অপরিচিতার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর যদি মন্তব্য

করা যায় 'মেয়েটি তো বেশ।' তবে পত্নীপক্ষ থেকে জবাব আসে —'কী বিচ্ছিরি ক্যাট্‌কেটে রঙের শাড়ি পরেছিলো!' তারপর মেয়েটির চেহারা, চুল বাঁধবার কায়দা, বেহায়াপনা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্যই হয়তো শুনতে হয়। মানুষের চেহারা সম্বন্ধেও পুরুষের বিচার সর্বাঙ্গীন। অর্থাৎ কোনো মেয়ের নিখুঁত চেহারাই পুরুষের চোখে ভালো লাগবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ চেহারায় কিছু খুঁত থাকলেও বুদ্ধিমান পুরুষের চোখে কোনো মেয়ে সুন্দরী বলে মনে হতে পারে, যদি তার চেহারায় মাধুর্য থাকে, চোখে মুখে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখা যায় ও দৃষ্টি ও হাসি আকর্ষণীয় হয়। পুরুষের বিচারপদ্ধতি অনেকটা সামগ্রিক, মেয়েরা দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নাকটা যথেষ্ট সরু ও লম্বা কিনা, চুল কত বড়, রঙ কতটা ফর্সা — এসব প্রত্যেকটি জিনিস মেয়েদের এক নজরেই চোখে পড়ে। কিন্তু পুরুষের চোখে সামগ্রিক ধারণাটাই প্রথমে আসে। এ কারণে বাড়ির বিবাহযোগ্য ছেলের জন্য মেয়ে পছন্দ করতে হলে মেয়েদেয় দেখা চাইই চাই। পুরুষরা কি দেখতে জানে? ছাই বোঝে পুরুষেরা। মোটামুটি ভালো লাগলেই বলে দেয় মেয়ে পছন্দ হয়েছে। কিন্তু মেয়েরা যখন দেখে, সে এক দেখার মত দেখা। চুল খুলিয়ে, হাঁটিয়ে, কথা বলিয়ে, হাত পা টিপে, দাঁড় করিয়ে, বসিয়ে, নানাভাবে দেখার পর বেশ সুশ্রী ও মধুরাকৃতি মেয়েরও অসংখ্য রকম খুঁত বেরোয় এবং এমনও দেখা যায় যে, সেই সব খুঁতের দরুন নবপরিণীতাকে শ্বশুরবাড়িতে চিরকাল বিরাগভাজন হয়েই থাকতে হয়।

এই সব কারণে মেয়েদের পক্ষে কাউকে চট্ করে পছন্দ করাই শক্ত। কিন্তু কোনো কারণে একবার পছন্দের পরীক্ষায় পাশ হলে তখন মেয়েদের পক্ষে আর কিছুই লক্ষ্য করবার দরকার হয় না। না চেহারা, না অন্য কিছু। কেননা এ-সব বিষয়গুলি তো শুরুতেই জানা হয়ে গেছে। এর পরও যাকে ভালো লাগলো, তার কোনো ত্রুটিতেই তখন আর কিছু যায় আসে না। তখন আর তার মধ্যে লক্ষ্য করবার মত কিছুই নেই এবং যা কিছু পূর্বে লক্ষ্য করা হয়েছে তাও অবান্তর।

অতএব এমিয়েল সাহেব তাঁর বান্ধবীর যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন, সেটা মোটামুটিভাবে সমগ্র নারীজাতির মধ্যেই অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়। অপরপক্ষে পুরুষজাতি অপরের খুঁটিনাটি দোষ-গুণগুলো লক্ষ্য করে ক্রমে ক্রমে, অনেকদিন ধরে। এ কারণে দেখা যায় যে খুব গভীর প্রেমে পড়ে বিবাহ করার পরও পুরুষ অনেক সময় স্ত্রীর প্রতি ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ ও বীতস্পৃহ হয়ে ওঠে। অথচ মেয়েরা যাকে একবার গ্রহণ করে, তাকে সাধারণত আঁকড়ে থাকতেই প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

এইরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দরুন মেয়েরা সহজেই তৃপ্ত, পুরুষ স্বভাবতই অতৃপ্ত এবং আমার মনে হয়, এই কারণেই মেয়েদের পক্ষে কাব্য রচনা করা অপেক্ষাকৃত শক্ত। উঁচুদরের মহিলা কবি পৃথিবীতে খুব কমই হয়েছেন। অশান্তি আর অতৃপ্তির থেকেই তো কাব্যের মর্মভেদী প্রকাশ। নারীর খুঁটিনাটি সহস্র বিষয়ের অনুমোদন ভেসে যায় পছন্দের স্রোতে। পুরুষের আনন্দ ও পছন্দের ফুলে এক এক

করে সহস্র অতৃপ্তির কীট জন্ম নিতে থাকে। সদা সন্তুষ্ট লোকের সুখ অক্ষুণ্ণ হতে পারে, কিন্তু তাকে দিয়ে সৃষ্টি-কার্য চলে না।

ইত্যাকার নানা কারণে, আমি ভেবে দেখেছি, শাস্ত্রকারেরা মানুষকে যেরূপভাবে চলবার উপদেশ দিয়ে গেছেন, তার অনেকগুলিই শিল্পীজীবনের পরিপন্থী। সাহিত্যিকের কাছে 'সদা সত্য কথা কহিবে' একটা বাজে কথা, কেননা কল্পনারূপী মিথ্যাই তো সাহিত্যের ভিত্তি। 'সর্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে' মেনে চলতে হলেও উঁচুদরের শিল্প-প্রতিভার বিকাশ হতে পারে না। তবে মেয়েদের সদা সন্তুষ্ট হতে বাধা নেই। ব্যতিক্রম যতই থাকুক, তারা তো প্রধানত শিল্পী নয়, শিল্পীর প্রেরণা মাত্র। তাছাড়া তারা সন্তুষ্ট থাকলে পুরুষের জীবনের ঝামেলা অনেক কমে।

মেয়েদের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের দেশে স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক ব্যবহারের অবাস্তবতা ও অস্বাভাবিকতার কথাও স্বতঃই মনে হয়। কথাবার্তায় ও লেখায় আমরা নারীজাতির প্রতি অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসপ্রবণ। মাতৃজাতির নাম করে গদগদ কণ্ঠে বিগলিত হতে আমাদের কোনো জুড়ি নেই। নারীর সম্মান, নারীর মর্যাদার প্রাচীন আদর্শ ও উদাহরণ প্রভৃতি নিয়ে গলাবাজি ও কলম-বাজি আমরা সমান উৎসাহসহকারেই করে থাকি। কিন্তু ঘরে ও বাইরে নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিবেচনাপ্রসূত আচরণ করা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। স্ত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার যদি আমরা নাও করি, তবু সঙ্গত ও সম্মানজনক আচরণ করি একথা খুব কম ক্ষেত্রেই বলা যায়। এ গেল ঘরে। ভ্রমণাদি ব্যাপারে 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য

নহিলে খরচ বাড়ে' বিবেচনা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'পথি নারী বিবর্জিতা' এই প্রাচীন উক্তি অনুসরণ করে চলতে চেষ্টা করি। এ-সব বিষয়ে গৃহবর্তিনীদের ইচ্ছা ও মনোকষ্ট বড় একটা বিবেচনা করি না। স্ত্রী নিয়ে রাস্তায় বেরুনো কচিৎ নেহাৎ প্রয়োজনেই ঘটে। কিন্তু যখনই বেরুনো যায়, তখনই আমরা অধিকাংশ পুরুষই লম্বা ঠ্যাং ফেলে আগে আগে চলি। অপেক্ষাকৃত খর্বকায়া সঙ্গিনীটি বহু পশ্চাতে হাঁপাতে হাঁপাতে স্টীমারে দড়ি বাঁধা গাধাবোটের মত আমাদের অনুসরণ করেন। তারপর খানিকক্ষণ পরে সঙ্গিনীর কথা মনে পড়ে গেলে দাঁড়িয়ে, তাঁকে কাছাকাছি আসবার সুযোগ দিয়ে, এক ধমক লাগাই — পেছনে পড়ে আছ কেন ? সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারো না ? যেন নারীকে অপেক্ষাকৃত মন্থরগামিনী করার ত্রুটি ও দায়িত্ব বিধাতার নয়, মেয়েদের নিজেদেরই। আমাদের দেশেই মাত্র ট্রামে বাসে 'লেডিজ ওনলি' বলে বসবার জায়গায় টিকেট লাগাতে হয় এবং সেই রিজার্ভ করা সীট ছেড়ে দিতে হলেও, মেয়েদের না দেখবার ভাণ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা, অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ ইত্যাদি করেই আমরা ক্ষান্ত হই না, মেয়েদের শুনিয়ে দু-একটা অসম্মান ও অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য করতেও কার্পণ্য করি না।'

অথচ স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে আমরা বাড়ির মেয়েদের প্রতি অতিরিক্ত সমীহ দেখাতে সর্বদাই আগ্রহান্বিত। 'আমার তো ছেলের বিয়েতে কোনোই দাবি নেই, তবে কিনা বাড়ির মেয়েরা বলছেন —', বলে আঠারো ইঞ্চি পরিমিত গহনার ফর্দ দাখিল করবার জন্য আমরা

অতিমাত্রায় ব্যগ্র। যে-স্ত্রীকে আজীবন কথায় কথায় ধমক দিয়ে এসেছেন, অলঙ্কারের লিষ্টি দাখিল করার সময় তাঁর অবিবেচনার জন্য তাঁকে আরেকটা ধমক দিলেন না কেন — এরূপ প্রশ্ন কেউ কাউকে করে না বলেই রক্ষে। নইলে জবাবদিহি করা শক্ত হোত।

দুঃখের বিষয় অপর নারী সম্বন্ধে মেয়েদের কোনো সহানুভূতি নেই। নারীসমাজের একে অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। পুরুষকে ঘিরেই তাদের সমস্ত চিন্তা আনন্দ ও তৃপ্তি, পুরুষকে দখল করে থাকাতেই তাদের মহাসুখ। দখল পাকা হয়েছে এই বোধ যত দৃঢ় হয়, ততই তারা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবতী বলে গণনা করে। এই দখলীস্বত্ব একমাত্র অন্য নারীর দ্বারাই নাকচ হতে পারে বলে যাবতীয় নারীসমাজ সম্বন্ধে তারা স্বভাবতই ঈর্ষা ও সন্দেহ-পরায়ণ। গৃহবাসিনী অপর নারীগণের কাছ থেকেও তারা সদয় ও সহৃদয় ব্যবহার আশা করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের দ্বারা অবহেলিত, উৎপীড়িত হলে কিম্বা অসম্মানজক ব্যবহার পেলে তাদের স্বভাবত সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ মন আরো সংকীর্ণ হয়, মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে থাকে এবং নিজেদের বঞ্চিত জীবনের প্রতিশোধ তারা অপরের উপর দিয়ে নিতে প্রবৃত্ত হয়। এ কারণে 'বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ'গণ যেরূপ অকারণে বা সামান্য কারণে ছেলেপিলে ঠেঙান, এরূপ কুত্রাপি দেখা যায় কিনা সন্দেহ। সংসারে গৃহিণীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর স্বামীকে এবং পৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে পুত্রবধূকে নানারূপভাবে নির্যাতন করায় আমাদের মহিলারা পরম সুখ অনুভব করেন। অবশ্য অপর একটি মেয়ে এসে পুত্রের দখলীস্বত্ব কেড়ে

নেওয়াতে সর্বদেশের মহিলারাই হয়তো পুত্রবধূর প্রতি ঈর্ষা ও বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। কিন্তু সেসব জায়গায়, নিজেরা পুরুষদের কাছ থেকে সর্বদা সদয়, ভদ্র ও সম্মানজনক ব্যবহার পান বলে, তাঁদের সে ঈর্ষায় এতটা বিষ থাকে না।

আমাদের স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক জীবন এরূপ অস্বাভাবিক বলে আমাদের জীবনে অসম্পূর্ণতার অসন্তোষ অত্যধিক বেশি। 'আমরা আপিসে সাহেব-বকুনি খাই' আবার ঘরে স্ত্রীদের সংগে বান্ধবতার সম্পর্ক-স্থাপনে অপারগ বলে সেখানেও অশান্তিতে দিন কাটাতে বাধ্য হই। একথা সকলেই জানেন যে, স্ত্রীপুরুষের জীবন পরস্পরের পরিপূরক। পুরুষের জীবনের যেগুলি দুর্বলতা, যেমন গার্হস্থ্য-জীবনে অসহায়তা, অপরের প্রতি জীবন-যাত্রার দায়িত্ব অর্পণ করবার স্বাভাবিক ঝোঁক, অত্যধিক কামনা-প্রবণতা এবং career-এর প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি, এইগুলোই নারীজীবনের অবলম্বন ও সৌভাগ্যের সোপান। আবার নারীচরিত্রের যে ক'টি ত্রুটি, যেমন পুরুষকে দখল করে থেকে তার উপর মাতৃত্ব ফলানোর প্রবৃত্তি, সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তৃপ্ত থাকবার আকাঙ্ক্ষা, অপর নারীর প্রতি ঈর্ষা ও সন্দেহের দরুণ তাদেরকে পারিবারিক জীবনের ব্যূহভেদ করতে না দেওয়া, এগুলোই পুরুষের জীবনকে নির্ঝঞ্ঝাট ও সুখী করে। পুরুষের গুণ মেয়েরা আয়ত্ত করতে চাইলে ফল যে কীরূপ মারাত্মক হতে পারে তা আমরা বিদ্যার ব্যাপারেই দেখেছি — যেখানে 'গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।' ইদানিংও অনেক মেয়ে পুরুষের সংগে পাল্লা দিতে গিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও

দাম্পত্য জীবনকে ছন্নছাড়া করে দেয়। অপরপক্ষে মেয়েলি পুরুষ যে কীরূপ বীভৎস 'লালিমা পাল (পুং)'-এই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আছে।

রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদায় খোলাখুলিভাবেই নারীর প্রতি পুরুষের উপযুক্ত ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। চিত্রাঙ্গদা স্পষ্টই বলেছেন যে তাঁরা দেবীও নন যে মাথায় নিয়ে নাচতে হবে কিম্বা ন্যাকা-ন্যাকা উচ্ছ্বাসে বিগলিত হতে হবে, আবার সামান্যাও নন যে তাঁদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা চলবে। অথচ আমরা এই দুটোই করতে অভ্যস্ত এবং সর্বদাই করে থাকি। মেয়েদের আমরা সহজে স্বাভাবিক মানুষের মর্যাদা দিই না। এ কারণে আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হচ্ছে অশ্লীল সাহিত্য, যাতে নারীর চরিত্র সম্বন্ধে কোনো শ্রদ্ধা নেই, অথবা ন্যাকা-সাহিত্য, যাতে নারী সম্বন্ধে অহেতুক বিগলিত ভাব আছে। সব মেয়েই ভালো নয়, কিন্তু সব মেয়েই মা হয়, অতএব খারাপ মা যে সংসারে কিছু থাকবে এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু গল্পে-উপন্যাসে আমাদের মায়েরা সর্বদাই মহামানবী। একমাত্র প্রেম করার যোগ্য মেয়ে ভিন্ন অন্য কোনো মেয়ের চরিত্র স্পষ্টভাবে আঁকতে আমাদের সাহিত্যিকরা প্রায়শই অপারগ বা পরাঙ্মুখ।

২৬

লেখার নেশা

মনবান্ মানুষ মাত্রই সংসারে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু বৃহত্তর জীবনে অত্যাবশ্যক একটা কিছু অবাস্তর বিলাস বেছে নেয়। সাহিত্যও তেমনি এক বিলাস, এক নেশা। সমস্ত চারুশিল্প, কারুশিল্পও তাই। হতে পারে মানবসমাজে মানবচিন্তায় ও মানুষের সর্বকালীন আনন্দবর্ধনে এ নেশার মূল্য অসীম, কিন্তু একথা মানতেই হবে যে সাহিত্য শিল্প ও ললিতকলার রচয়িতাদের কাছে এগুলো নেশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যদি নেশাই না হবে, তাহলে ইস্কুলের ছেলেরা অঙ্কের খাতায় পদ্য লিখে মার খাবার পরও আবার ইতিহাস খাতায় ছন্দ মেলাতে যায় কেন? আর উচ্চ-শিল্প-স্রষ্টার জীবন সাধারণত অবজ্ঞাত ও অভাব-জর্জরিত জেনেও শিল্পীরা শিল্পসৃষ্টিতেই ডুবে থাকতে ভালোবাসেন কেন? রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "লেখা-লেখা খেলা সেই খেলায় এমন নেশা, এত উন্মাদনা আছে বলেই লেখার এত মূল্য, এত সমাদর। নেশার মত যা সমস্ত সত্তা ও চেতনাকে জড়িয়ে ধরে না, শুধু ভাসা ভাসা ভাবে যা ভাল লাগে, তা নিয়ে কোনো বড় সৃষ্টি, কোন মহৎ কর্ম হয় না। ঢেউয়ের ফেণার মতই তা ভাসতে ভাসতে এক সময়ে হারিয়ে যায়।

আমি নেশার কথা বলতে বসি নি, বলছিলাম, সাহিত্য-শিল্পের

দুর্দমনীয় আকর্ষণের কথা, এবং বলতে চাইছিলাম যে ললিত-কলা সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার যে অনতিক্রম্য ঝোঁক ও আকাঙ্ক্ষা তাকে বর্ণনা করতে হলে একমাত্র নেশা কথাটা দিয়েই কিছুটা বোঝানো চলে। আসলে দৈনন্দিন সংসারযাত্রার সমস্ত ফাঁকগুলি ভরাট করে এবং অবসরের সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত ক'রে যা আমাদের মনকে তারই দিকে একলক্ষ্য করে তোলে, তাকে আমরা খেলো কথায় বলি নেশা, কিন্তু অনেক সময় মানবজীবনে এই নেশা জীবনের চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়ায়। যখন তা হয়, তখনই এর থেকে উদ্ভূত রচনা মহৎ ও সার্থক।

সেদিন এক বিখ্যাত কবির সঙ্গে অনেকদিন পরে হঠাৎ দেখা হোল। কথায় কথায় জানলাম, এঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে যাঁকে চিরকাল জেনে এসেছি, তাঁর সঙ্গে এই কবির গুরুতর কলহ ঘটে গেছে — মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তার কারণ আর কিছুই নয়, সাহিত্য সম্বন্ধে এই ভদ্রলোকের কতকগুলি মতামতের সঙ্গে তাঁর বন্ধুটির মতামতের পার্থক্য ঘটেছে। অতএব কলহ, এবং সেই কলহ সাহিত্য ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে।

এঁরই হচ্ছে খাঁটি সাহিত্য-প্রেম। চিরকালই দেখেছি ব্যক্তিগত-ভাবে ভদ্রলোক সকলেরই কাছে অপ্রিয়। কেউ তাঁকে পছন্দ করে না, কারণ ভদ্রলোক অত্যন্ত রূঢ়ভাষী, এবং সে রূঢ়ভাষা তিনি সর্বদাই প্রয়োগ করেন সাহিত্যিক মতদ্বৈধে, যেটা প্রায়শই পরে অনেকদূর গড়ায়। কিন্তু সাহিত্য তিনি নিজে যেমনভাবে বোঝেন, তার প্রতি তাঁর এমনি মোহ যে, তার জন্য তিনি নিজের ব্যক্তিগত

স্বার্থ ক্ষুণ্ন করেও লোকের সঙ্গে কলহ করতে সর্বদাই প্রস্তুত। সাহিত্যিক গোঁড়ামির জন্য এই ভদ্রলোককে জীবনে বহু আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। বহু সম্মান ও প্রীতি থেকেও ভদ্রলোককে বঞ্চিত হতে হয়েছে এই একগুঁয়েমি গোঁড়ামি ও রূঢ়-ভাষার শাস্তি হিসেবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের সঙ্গেও এই ভদ্রলোকের বহু সাহিত্যিক মতামতের বিরোধ আছে এবং ওঁর সঙ্গে বেশিক্ষণ ধরে মেলামেশা করতেও আমি নারাজ। কিন্তু তবু শুধু তাঁর রচনার প্রতিই নয়, ব্যক্তিটির প্রতিও আমি সাহিত্যিক হিসেবে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি।

সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকের পক্ষে ঠিক এতটা সাহিত্যিক গোঁড়ামি নিস্প্রয়োজন, কিন্তু নিজের রচনাকে সৃষ্টির পর্যায়ে তুলতে যিনি উৎসুক, তাঁর পক্ষে কতকগুলি সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল ধারণা ও মতামত থাকাই ভালো। ভাসা ভাসা সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্যবোধ সম্বল করে অথবা সাহিত্যের লক্ষ্য আদর্শ বা করণীয় সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে সাহিত্য- সৃষ্টি অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়।

খুব গুরুতরভাবে কাব্যরসে আচ্ছন্ন বা অভিভূত না হলে কোনো ব্যক্তিই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হতে এবং তাতেই লেগে থাকতে পারে না। কীরূপভাবে কবিতার নেশায় আক্রান্ত হলে লোকে জমিদারী হিসেবের খাতায় গান লিখিতে পারে, তা কল্পনা করে নেওয়া মোটেই শক্ত নয়। আর এতখানি কাব্য-নেশায় অভিভূত হয়েছিলেন বলেই রামপ্রসাদ এত বড় হতে পেরেছিলেন।

অন্য কোন উপযুক্ত শব্দ না থাকার ফলে 'নেশা' শব্দটি দিয়েই এই দুরতিক্রম্য ঝোঁককে বোঝাতে হয়। আসলে যে আসক্তি জীবনের সমস্ত প্রয়োজন, সকল হিসাব-নিকাশকে ছাড়িয়ে যায়, সেই নেশার একাগ্রতা থেকেই ললিতকলা জন্ম নেয়। যে লোকটি সমস্ত সাংসারিক অভাব অভিযোগের কথা, স্ত্রী-পুত্র পরিজনের প্রয়োজনের কথা, নিজের উন্নতি বা প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা সব ছেড়ে দিয়ে আফিং বা মদের নেশায় ডুবে থাকে, তার সঙ্গে যে সাহিত্যিক সকল অভাব-অভিযোগ অগ্রাহ্য ক'রে লেখার নেশায় মগ্ন হয় তার বড় বেশি তফাৎ নেই, — অবশ্য যদি শুধু আসক্তির তীব্রতার দিক থেকেই মাত্র জিনিসটিকে বিচার করা যায়। গভীর আসক্তিকে অখণ্ড অভিনিবেশের সঙ্গে প্রচণ্ডবেগে এক দিকে প্রবাহিত করতে পারাই একটা কৃতিত্ব — এ কৃতিত্বকে কেউ ভালো দিকে পরিচালিত করেন, কেউ বা মন্দ দিকে। গভীর আসক্তির প্রকৃতি যে সবক্ষেত্রেই প্রায় একই, একথা যদি সত্য না হোত, তাহলে বিল্বমঙ্গল অত সহজে লম্পট থেকে ভক্তাগ্রগণ্যে পরিণত হতে পারতেন না। সেই জন্য যদি সাহিত্যই করতে হয়, তবে সাহিত্যের নেশা করাই ভালো।

২৭

শেষ কথা

মন পবনের নাওয়ের পাড়ি শেষ করতে বসে আজ মনে হচ্ছে যে স্বচ্ছন্দ আবহাওয়ায় অনেক স্রোত কাটিয়ে আসা গেল। আমার মত অপণ্ডিতের যা পুঁজি সেই সাধারণ বুদ্ধির দাঁড় টেনেই এতদূর এগিয়ে আসা গেছে, অসাধারণ বুদ্ধি ও বিদ্বত্তার গুণ টানতে হয়নি।

পাঠশালার পড়া সাঙ্গ করার পর থেকেই মনের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে যে, অসাধারণ বুদ্ধির দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থেকে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে সাধারণ বুদ্ধির তোয়াজ করলে সদ্য ফল লাভের সম্ভাবনা ঢের বেশি। কারণ সাধারণ লোকের পক্ষে অসাধারণ বুদ্ধির দেবলোক দুরধিগম্য তো বটেই, এমন কি অনধিগম্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সকল লোকই যদি জীবনকে এবং বিভিন্ন উপলব্ধিগোচর তথ্য ও তত্ত্বকে সাধারণ ও সহজভাবে বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারতো, তাহলে জাগতিত ভুল-বোঝার দ্বন্দ্ব যে অনেকখানি কমে যেত, তাতে আর সন্দেহ কী? জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই সহজ অর্থ আর গূঢ় অর্থের দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়েই সাধারণ লোকের যত অশান্তি। সোনার তরী চিত্রা বলাকা ভালো লাগে। কিন্তু যেই গূঢ় অর্থ খুঁজতে যাওয়া গেল অমনি হাজার অর্থসূত্রে খেই হারিয়ে একেবারে নাজেহাল। যেন একটা লোকের সাহচর্য বড়ই ভালো লাগছে। হাঠাৎ তার

নাড়ী-নক্ষত্রের খবর নিতে গিয়ে কোনো নিষ্প্রয়োজন তথ্য জানতে পেরে তার সংগসুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।

মানুষের অনুভূতি ও বুদ্ধি সর্বদাই ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সহজ ও উন্মুক্ত পথে চলে, সরীসৃপের মত নিগূঢ় তত্ত্বের বিবর খুঁজে বেড়ায় না। এই গূঢ়তত্ত্বের সন্ধানীদের ভয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক অপরূপ কথা বলা শেষ করে নিজেই তার টীকা জুড়ে দিয়েছেন যে এর কোনো মানে নেই। বস্তুত, আমরা যে আকাশ বাতাস ফুল তারা পাহাড় নদী ভালোবাসি, হাজার নরনারীর মধ্যে এক একজনকে যে সহসা সবার চেয়ে আপন মনে হয়, মনোবীণা যে কখনো উদাস কখনো করুণ কখনো আনন্দের সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, এরও সহজ বুদ্ধিতে কোনো মানে নেই। কিন্তু এই ভালো লাগার গূঢ় অর্থ জানবার জন্য মনস্তাত্ত্বিকের শরণাপন্ন হলে এমন সব লোমহর্ষক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হতে পারে যে সকল আনন্দ হারিয়ে গিয়ে মনটা লজ্জা ও গ্লানিতে সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে।

সাধারণ বুদ্ধি আর সহজ উপলব্ধি দিয়ে জীবনে যেটুকু বোঝা যায়, সেটুকুই খাঁটি বোঝা। কেবল প্রকৃতি ও জীবন নয়, শুধু মানুষকে নয়, জীবনের শ্রেষ্ঠাংশের প্রতিফলনে, জীবনের সত্য শিব ও সুন্দরাংশের স্তুতিতে যে সাহিত্য শিল্প ললিতকলা গড়ে ওঠে, তারও উপভোগ এবং উপলব্ধির পথ সাধারণ ও সহজ বুদ্ধির সদর দরজা দিয়ে, একথাই বিশ্বাস করি। সাধারণ বুদ্ধিটুকু সম্বল করে ভাবের অতল তলে ডুব দেওয়া যায় — যেমন আমাদের কবি গেয়েছিল —

আমি ডুব দিয়েছি
রসের সায়রে।

মানুষের যেটা নিজস্ব জীবন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র জটিলতা নেই, দুর্বোধ্যতা নেই একটুখানি। হাজার বছর আগের মানুষ যে আকাঙ্ক্ষা যে আশা নিয়ে ঘর বেঁধেছিল, আমাদের আজকের ঘর বাঁধা'র পিছনেও তার চেয়ে এক কণা বেশি আশা আকাঙ্ক্ষা নেই। কোনো নতুনত্ব নেই আজকের প্রেমে সে দিনকার প্রেম থেকে। আবেগগুলি সবই জানা, সবই বোঝা, সবই সহজ। তাই যদি না হবে তবে যুগে যুগে কবিরা সাহিত্যিকরা শিল্পীরা তাঁদের তুলি ও লেখনীতে আমাদের মনের কথা এঁকে গেলেন কী করে?

মানুষের জীবনে আজ জটিলতা এসেছে মানি, কিন্তু সে শুধু তার বাইরের জীবনযাত্রায়, অন্তরে নয়। আর সাহিত্য শিল্প ললিত-কলার কারবার যখন খাঁটি ও অন্তরঙ্গ জীবন নিয়ে, রেশন আর ডাস্টবিন নিয়ে নয়, তখন সে জীবনকে এবং সে সাহিত্যকে জানতে আর সাধারণ বুদ্ধির চেয়ে বেশি পুঁজির প্রয়োজন কী?

সেই সহজ বুদ্ধির পাল তোলা মনপবনের নাও নিয়ে এক চক্কর ঘুরে আসা গেল। বড় বজরার বড় দাঁড়ের প্রতি ঈর্ষা করি না। খোলা হাওয়ায় মন জুড়োতে আমার এই ছোট্ট ডিঙিই ভালো।